# পূর্ণিমার রাতের প্রেম

কৃষণ চন্দর

অনুবাদ
জাফর আলম

১৯৪২ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় মানবতা কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তারই করুণ চিত্র এঁকেছিলেন কৃষণ চন্দর 'অন্নদাতা' উপন্যাসে। 'অন্যদাতা' উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ছিল কৃষণ চন্দরের বিখ্যাত গল্প 'মুবি'; সামনে 'প্রদীপ' ও 'ভগতরাম'। ভিন্ন স্বাদের গল্প তিনটি পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দেবে। 'পূর্ণিমার রাতের প্রেম' গ্রন্থে তিনটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করেছি। গল্প তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল বন্ধুবর রেজাউল করিম সম্পাদিত মাসিক 'সঞ্চয়' ও 'চিত্রালী'তে আশির দশকে।

'জামগাছ' গল্পে কৃষণ চন্দর আমলাতন্ত্রের লালফিতার কারণে কি সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সরকারী প্রকল্পের নামে যে দুর্নীতি ও অর্থের অপচয় ঘটে তারই চিত্র এঁকেছেন 'কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা' গল্পে। 'পেশোয়ার একপ্রেস' গল্পে অপূর্ব দক্ষতার সাথে তিনি ভারত বিভাগের করুণ চিত্র এঁকেছেন, যেখানে শত শত নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। 'বোবার প্রেম' এবং 'পূর্ণিমার রাতের প্রেম' দু'টি গল্পই কৃষণ চন্দরের রোমান্টিক মনের পরিচয় বহন করে। 'বিচারক' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, অনেক সময় বিচারকরাও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নিজের মেয়েকে পুরস্কারের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অবিবেচকের ন্যায় কাজ করে থাকেন। 'আলো চাই' গল্পে লেখক চাকুরিজীবী মেয়েরা এখনও রাতে পথে-ঘাটে চলাফেরায় নিরাপদ নয়- একথাই প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এধরণের ঘটনা এদেশেও বিরল নয়। 'মিস নৈনিতাল' গল্পে কৃষণ চন্দর অত্যন্ত মুন্সিআনার সাথে তুলে ধরেছেন, বড়লোকের মেয়ের আহত কুকুরের কাছে হাসপাতালে বাঘের আক্রমনে ক্ষত বিক্ষত গরীব যুবকের জীবন মূল্যহীন। 'মন্ত্রীর অসুখ' গল্পে লেখক রাজনীতিবিদদের সারহীন ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার ব্যঙ্গ চিত্র এঁকেছেন, যা রাজনীতিবিদদের বেলায় প্রযোজ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পূর্ণিমার রাতের প্রেম

মূল ঃ কৃষণ চন্দর

জাফর আলম
অনূদিত

আহমদ পাবলিশিং হাউস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারি ২০০২
ফাল্গুন ১৪০৮

প্রচ্ছদ | সমর মজুমদার

বর্ণবিন্যাস | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | আশি টাকা মাত্র

**Purnimar Rater Prem** [Love in the night of full moon]
Stories of Krishan Chandar Translated by Zafar Alam.
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100.
First Edition : February 2002.
**Price : Tk. 80.00 only.**

ISBN 984-11-0522-X

পূর্ণিমার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# অনুবাদকের কথা

উর্দু সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাশিল্পী কৃষণ চন্দর। সত্তরের দশকের বহু সংখ্যক কৃষণ চন্দরের গল্প ও উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থাগারের প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদকদের মধ্যে বন্ধুবর সাংবাদিক আখতারুন্নবী এবং কামালুদ্দীন শামীমের নাম উল্লেখযোগ্য। আমারও অনূদিত কৃষণ চন্দরের ১টি গল্প সংকলন ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় একই সময়ে।

কৃষণ চন্দরসহ অন্যান্য উর্দু কথাশিল্পীদের গল্প বা উপন্যাসের অধিকাংশ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। এরপর আশি ও নব্বই-এর দশকে ঢাকায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল সীমিত।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উপ-পরিচালক অনুজপ্রতিম শফিকুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতায় আমার অনূদিত কৃষণ চন্দরের ছোট গল্প সংকলন **"পূর্ণিমার রাতের প্রেম"** প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

আহমদ পাবলিশিং হাউসের তরুণ পরিচালক মেছবাহউদ্দীন আহমদ আমার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং আমার অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বইটি প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়ায় আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন আমাদের প্রিয় শিল্পী সমর মজুমদার। তার প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমার অনূদিত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় কৃষণ চন্দরের গল্প সংকলন **"পূর্ণিমার রাতের প্রেম"** গ্রন্থটিও পাঠক সমাজে আদৃত হবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

তারিখ ঃ ৩১ জানুয়ারি, ২০০২

—জাফর আলম

মিরপুর, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# অমর উর্দু কথাশিল্পী কৃষণ চন্দর

উর্দু সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী কৃষণ চন্দর। ১৯১৪ সালের ২৩শে নভেম্বর পাকিস্তানের গুজরান ওয়ালা জিলার উজিরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তার পিতা গৌরী শংকর ডাক্তারী করতেন। কৃষণ চন্দরের ছোট তিন ভাই ও একবোন। মহীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথ এবং বোনের নাম সরলাদেবী। সরলা দেবী ও একজন উঁচুদরের উর্দু ও হিন্দী লেখিকা ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৮ই মে সরলাদেবী মারা যান। তার ছোট ভাই মহীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ। তিনি লাহোর ফার্মন ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে এফএসসি পাশ করেন। পিতার ইচ্ছা ছেলে ডাক্তার হোক কিন্তু কৃষণচন্দরের প্রবল ঝোক ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য। তাই এইসব বিষয় নিয়ে বি.এ. এবং ১৯৩৭ সালে লাহোর কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে লাহোর 'ল কলেজ থেকে এল. এল. বি পাশ করেন। হাইস্কুলে তিনি উর্দু ও ফার্সী ভাষা পড়েছিলেন।

খেলাধুলা বিশেষতঃ ক্রিকেটে তিনি উৎসাহী ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতে তাঁর শখ ছিল। নাটকে কাজ করার ও খুব শখ ছিল। একটি নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলেন। এম. এ. পড়ার সময় ইংরেজী বিভাগের পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষাশেষে কৃষণচন্দর কয়েক মাস 'Northern Review' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকায় সাংবাদিকতা এবং একজন ইংরেজ মহিলা ফরিদার সঙ্গে 'The Modern girl' নামে একটি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। স্কুলে পড়ার সময় একজন শিক্ষককে রচিত প্রথম ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য শিক্ষকের অভিযোগে তিনি পিতার কাছে শাস্তি পেয়েছিলেন। কলেজ জীবন থেকে কৃষণ চন্দর উর্দু ছোটগল্প রচনায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ইংরেজীতেও তিনি লিখতেন। হিন্দী ভাষায় তার কিছু রচনা রয়েছে।

এ সময় ভারতে চলছিল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। কৃষণ চন্দর এই আন্দোলনে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সমাজতান্ত্রিক দর্শন নিয়ে তিনি প্রচুর লেখাপড়া করেছেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের সভায় অংশ নিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার তিনি ঝাড় দার সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি ভগৎ সিং এর দলে যোগ দেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অপরাধে লাহোরে দু'মাস জেলও খেটেছেন। দু'টি ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। দেশকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন ভারতে সমাজতন্ত্রি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

তার প্রকাশিত প্রথম উর্দু গল্পের নাম য়্যারকাস (পাণ্ডুরোন) লাহোরের আদবী দুনিয়া সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার **"ঝিলম পর নাও"** গল্প প্রকাশের পর উর্দু তথা সাহিত্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এ সময় তিনি কলিকাতা সফর করেন। বাংলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার কৃষকদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তার বিখ্যাত নভলেট "অন্নদাতা" এর এভাবেরই ফসল।

কৃষণ চন্দর প্রগতিশীল লেখক (১৯৩৬) আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। এদের তার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় প্রগতিশীল লেখক সংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষণ চন্দর তাতে অংশ নিয়েছিলেন। তাকে এই সম্মেলনে পাঞ্জাব শাখার সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। ১৯৩৯ সালে কৃষণ চন্দর লাহোর অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে চাকুরি নেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন।

লাহোরে একবছর কাজ করার পর তিনি দিল্লী রেডিও স্টেশনে, একবছর পর তাকে বদলী করা হল লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। এখানে তাকে নাট্য বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। রেডিওতে চাকুরিকালে তিনি অনেক রেডিও নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে সরায়-কে-বাহের বিখ্যাত। পরে তিনি এই গল্প ভিত্তি করে ছায়াছবি নির্মাণ করেছিলেন। তার বিখ্যাত উপন্যাস শিকস্ত। সাকী পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত উর্দু লেখক শাহেদ আহাম্মদ দেহলভীর জন্য কাশ্মীরের একটি হোটেলে বসে মাত্র বাইশ দিনে এই উপন্যাস রচনা শেষ করেন। আজও উর্দু উপন্যাসের ইতিহাসে 'শিকস্ত' কে প্রধান ভিত্তি বলে গৃহীত হয়। এই উপন্যাস প্রকাশের ফলে কৃষণ চন্দরকে এক স্বতন্ত্র শৈলীর অধিকারী উপন্যাসিক হিসাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশনের চাকুরিতে তার মন টেকেনি। তিনি স্বাধীনচেতা মানুষ। তাই চাকুরি ছেড়ে পুনা চলে যান এবং শালিমার পিকচার্স এ যোগদান করেন। তার রচিত কাহিনী ভিত্তিক প্রথম ছবি "মন কি জিত"। দিল্লী অলইন্ডিয়া রেডিওতে কাজ করার সময় সাদাত হাসান মান্টো, খাজা আব্বাস প্রমুখ উর্দু কথা সাহিত্যিকদের সাথে তার হৃদ্যতা গড়ে উঠে। পুনে ছেড়ে তিনি বোম্বে চলে আসেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই শহরেই অবস্থান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[ছয়]

বোম্বেতে তিনি ফিল্মের জন্য গল্প লেখা, চিত্রনাট্য রচনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি নিজে দু'টি ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। চিত্রনাট্য ও তার লেখা। সেগুলো হল, 'সারায়ে কে বাহার' (সরাইয়ের বাইরে) এবং 'দিল কি আওয়াজ' (হৃদয়ের বাণী)। কিন্তু দু'টি ছবিই ফ্লপ করে। তাই তিনি আর চিত্র পরিচালনায় হাত দেননি। অবশ্য ছবির জন্য কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখতেন কিন্তু এতে তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। তাই তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। লেখালেখিই ছিল তার আজীবন বৃত্তি। সম্ভবতঃ কৃষণ চন্দর মুষ্টিমেয় উর্দু কথাশিল্পীদের অন্যতম যিনি লেখালেখির আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তার রচনার ষ্টাইল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃষণ চন্দর জীবনকে ভালবাসতেন। জীবনকে তিনি হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে কাব্যময় করে তুলতেন তাঁর গল্পের চরিত্র ও প্লট। তার লেখনি শুধু রোমান্টিকতায় সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাই তিনি রচনা করেছিলেন কালু ভাংগী (কালু মদ্যপ) পেশোয়ার এক্সপ্রেস ও ডিনার প্রভৃতি গল্প। সকল পরিবেশ ও শ্রেণীর লেখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সব ব্যাপারে তিনি আপোষ করতে রাজী কিন্তু নীতির প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। মানবতা সেখানে অবহেলিত লাঞ্ছিত, সেখানে কলমের খোঁচায় মানুষের চেতনাকে সচেতন করতে কখনও পিছপা হননি। তাই দেশ বিভাগের উপর কাহিনীকে ভিত্তি করে রচনা করেছিলেন বিখ্যাত উপন্যাস 'গাদ্দার' আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভিত্তিক উপন্যাস "হ্যাম ওয়াহসী হ্যায়।"

তার রচিত গল্প উপন্যাস ভারতীয় ভাষা ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়ায় তার গ্রন্থের সমাদর ছিল সবচেয়ে বেশি। চীন, রাশিয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন। গাদ্দার উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক কারণে দেশ বিভাগ হয়েছে কিন্তু দু'টি তরুণ-তরুণী হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক তারাতো কোন অপরাধ করেনি। তাদের প্রেমতো নিষ্পাপ ভেজালহীন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানবতার অবমাননা তিনি সহ্য করতে পারেনি। তাই তিনি মানবতার জয়গান গেয়ে রচনা করেন "হ্যাম ওয়াহাসী হ্যায়" নামক কালজয়ী উপন্যাস।

উর্দু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তার পঞ্চাশতম জন্মদিনে সরকার পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৬ সালে তাকে দেয়া হয় সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার।

তার রচিত গল্পের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের বেশি আর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০১টি। চীনা ভাষাসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় তার ব্যুৎপতি ছিল। দীর্ঘ চারদশক যাবত তিনি উর্দু কথা সাহিত্যকে তার লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাদাত হাসান মাণ্টো উর্দু ছোটগল্পকে আধুনিতার কাঠামোতে ঢালাই করেছেন। আর একে মানবিক গুণাবলীতে উদ্ভাসিত করেছেন কৃষণ চন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[ সাত ]

লেখকদের মদ্যপান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কৃষণ চন্দর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মাদকদ্রব্য অভ্যাস বা মদ্যপান মোটেই প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন, "লেখার সময় মদ তো দূরের কথা এমন কি পানাহারের কথা পর্যন্ত তিনি ভুলে যেতেন। খালি পেটেই তিনি তার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর লেখা শেষ করেছেন বলে জানান। অবশ্য অনেকে নাকি মদ পান না করে লিখতে পারেন না। প্রখ্যাত উর্দু লেখক রতননাথ সরসার মদ পান করেই লিখতে বসতেন এবং এভাবেই তার বিখ্যাত গ্রন্থ "ফসানায়ে আজাদ" লেখা শেষ করেন।

কৃষণ চন্দর ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক, পয়সা পেলেই দেদার খরচ করতেন। ভাল খাবার পছন্দ করতেন। লেখার জন্য চাই সুন্দর কাগজ ও কলম। বাড়িতে হৈ চৈ চলছে কিন্তু তিনি লিখেই চলেছেন। তাঁর অপব্যয় সম্পর্কে সরলাদেবী এক নিবন্ধে লিখছেন, "একবার ভাইজান দিল্লী এলেন। তখন বিল্ডিং এর ডিজাইনের প্রদর্শনী চলছিল। মা প্রতিদিন বলতেন, বাবা দেখে এসো। কয়েকদিন কৃষণজী এড়িয়ে গেলেন। শেষে একদিন আমাদের সাথে প্রদর্শনী দেখতে গেলেন। সত্যিই অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ির ডিজাইন প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়ির ডিজাইন দেখে মা ঠান্ডা নিঃশ্বাস ফেলেন আর কৃষণজীর দিকে তাকান। কৃষণজী ডিজাইনও দেখেন না। মায়ের দিকেও তাকান না। কৃষণজী বাইরে এলে মা এবার আর চুপ থাকলেন না বললেন, "বাবা তুমি এরকম একটা বাড়ি তৈরি করতে পারনা।" কৃষণজী হেসে উত্তর দিলেন, "মা আপনি কোন্ বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন ? অমন কতো বাড়ি তো গ্লাসে গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছি।" এতে সুস্পষ্ট কৃষণ চন্দরের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। অবশ্য লেখার সময় মদপান করতেন না বলে তিনি আগেই স্বীকার করেছেন।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মাপকাঠি সম্পর্কে কৃষণ চন্দর বলেছেন, "সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশের প্রতি যিনি যতই উপযুক্ত রূপে সজাগ এবং সুন্দরভাবে তার প্রতিচ্ছবি আকর্ষণীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। তিনি সবচেয়ে ভালো লেখক বা সাহিত্যিক।"

সেক্স সম্পর্কে কৃষণ চন্দরের অভিমত সুস্পষ্ট। তার মতে, "সেক্স" মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি নিজেও আমার রচনায় অনেক ক্ষেত্রে যৌন জীবনকে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছি। সেক্স ছাড়া মানুষের জীবন থেকে অনেক সমস্যা আছে যা আমার বা আপনার দৈনন্দিন জীবনে দিন দিন দুঃখ ও বেদনার বোঝা ভারাক্রান্ত করছে। অবশ্য বর্তমান দুর্নীতি ও ভেজালের জমানায় কতিপয় শক্তিধর ও প্রভাবশালী শ্রেণীর কার্যাবলীর ফলশ্রুতি সামাজিক অনাচার ও অবিচার। যার ফলে সেক্সকে সাহিত্য থেকে অনেক ক্ষেত্রে বাদ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। লেখক প্রথম শ্রেণীর হোন বা তৃতীয় শ্রেণীর হোন নিজের প্রতিভাকে শুধুমাত্র সেক্সের জন্য অপচয় করা অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[ আট ]

১৯৫৯ সালের মে মাসে বোম্বাইএ কৃষণ চন্দরকে সাড়ম্বরে সম্বর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়। সে সময়েই তার হৃদরোগ দেখা দেয় এবং এরপর তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। দু'টি ঘটনা কৃষণ চন্দরকে বিশেষভাবে আঘাত করেছিল। ছোট ভাই মহীন্দেরের আকস্মিক মৃত্যু, এবং দুর্ঘটনায় বোন সরলাদেবীর মৃত্যু। এই দুই আঘাতের পর তার বড় ধরনের হার্ট-অ্যাটাক হয়। শেষে পেসমেকার বসানো হল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর যেন তার পেসমেকারটি কোনো গরীব রোগীর দেহে লাগানো হয়।

কৃষণ চন্দর খাঁটি শিল্পীর মতোই জীবনযাপন করেছেন– স্বাধীনভাবে; তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী দিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। নিজের বিত্তবৃদ্ধির আনুকূল্য করার অনুমতি বা সুযোগও কাউকে দেননি। পুঁজিবাদের বিরোধিতাই ছিল তার ব্যক্তিত্বের বিশেষ উপাদান।

কৃষণ চন্দর অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ ছিলেন। তিনি ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর সকল নিপীড়িতদের সাথী ছিলেন তিনি। দুনিয়ার সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি, তা সে যতই শক্তিধর হউক, সাম্রাজ্যবাদিতায় হোক বা ধর্মীয় গোঁড়ামিতেই হোক।

অনেকে হয়তো জানেন না। কৃষণ চন্দর কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখেননি। তাঁর সম্পর্ক ছিল শুধু নিপীড়িতদের সাথে এবং লেখক হিসেবে কৃষণ চন্দর সর্বদা নিপীড়িতদের কাছে তাঁর আদর্শ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজেকেও নিপীড়িতদের একজন বলে গণ্য করতেন। এদের থেকে নিজেকে পৃথক বা বড় মনে করতেন না।

কৃষণ চন্দদের প্রথমা স্ত্রী দয়াবতী, তার ছিল তিনটি সন্তান। একটি ছেলে, দু'টি মেয়ে। পরে তিনি উর্দু লেখিকা সালমা সিদ্দিকীকে বিয়ে করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনিই তার প্রিয় সাথী ছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে কৃষণ চন্দর তার স্ত্রী সালমা সিদ্দিকীকে বলেছেন, "আমার ডাক এসে গেছে, আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও। আমার মৃত্যুর পর কান্নাকাটির দরকার নেই। এখানে আরও কয়েকজন হৃদরোগী আছেন। তোমার কান্নার শব্দে তাঁদের কষ্ট হবে।"

উর্দু সাহিত্যের এই মহান কথাশিল্পী ১৯৭৭ সালের ৭ই মার্চ বোম্বেতে ৬২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যুতে উর্দু সাহিত্য যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা অপূরণীয়। তবে কৃষণ চন্দর বেঁচে থাকবেন উর্দু সাহিত্যে রূপকথার যাদুকর হিসেবে। একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে, তাঁর সৃষ্টির মাঝে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

## সূচিপত্র


জাম গাছ ১১

মুবি ১৭

ভগতরাম ৩৭

বোবার ভালবাসা ৪৭

পূর্ণিমার রাতের প্রেম ৫৫

মিস নৈনিতাল ৬৩

পুল ৬৯

বিচারক ৭৪

আলো চাই আলো ৭৯

পেশোয়ার এক্সপ্রেস ৮৩

মন্ত্রীর অসুখ ৯২

কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা ৯৬

সামনে প্রদীপ ১০৩


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# জাম গাছ

রাতে প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে। সেক্রেটারিয়েট ভবনের লনের জাম গাছটা ঝড়ে উপড়ে পড়েছে। সকালে মালী দেখতে পায় গাছটার নিচে একজন লোক চাপা পড়েছে।

মালী ছুটে চাপরাশির কাছে গেল–চাপরাশি ছুটতে ছুটতে কেরানীর কাছে গেল—কেরানী ছুটতে ছুটতে সুপারের কাছে।

সুপার ছুটে বাইরের লনে এলো। দেখলো ঝড়ে উৎপাটিত গাছের নিচে যে মানুষটি চাপা পড়ে আছে তার চারিদিকে বেশ ভীড়।

একজন কেরানী আক্ষেপ করে বলল, আহা, এই জামগাছে কত ফলই না ধরত।

আর একজন কেরানী তাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলল, আহা জাম কী রসে ভরপুর ছিল।

অপর একজন কেরানী বলল, ফলের মৌসুমে আমি থলে ভর্তি করে এই ফল নিয়ে যেতাম। আমার ছেলেমেয়েরা কত আনন্দেই না এই জাম খেতো।

মালী গাছের নিচে চাপা পড়া মানুষের দিকে ইশারা করে বলল, আর এই মানুষ।

'হ্যাঁ, এই লোকটা .....।' সুপার ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। একজন চাপরাশি জিজ্ঞাসা করল, জানি না লোকটা মরে গেছে না বেঁচে আছে।

অন্য একজন চাপরাশি বলল, বোধহয় মারাই গেছে, এত ভারী গাছ কোমরের উপর পড়লে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

গাছের নিচে চাপা পড়া লোকটা বেশ রুদ্ধ স্বরে বলল, না, আমি মরিনি বেঁচে আছি।

একজন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আরে, বেঁচে আছে!

মালী প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলল, গাছটিকে সরিয়ে লোকটাকে তাড়াতাড়ি বের করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন স্বাস্থ্যবান চাপরাশি বলল, মনে হয় ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। গাছের গুঁড়িটা বেশ ভারীই হবে।

মালী জিজ্ঞাসা করল, সোজা নয় কেন? সুপার যদি হুকুম দেন, তবে আমরা পনেরো বিশজন চাপরাশি আর কেরানী মিলে গাছের নিচে থেকে লোকটাকে উদ্ধার করতে পারি।

কয়েকজন কেরানী মালীকে সমর্থন করে বলল, হ্যাঁ, মালী ঠিকই বলেছে। আমরা তৈরি, সকলে হাত লাগাও।

অনেকে গাছটাকে সরানোর জন্য তৈরি হয়ে গেল।

সুপার হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও আমি আন্ডার সেক্রেটারীকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।

সুপার আন্ডার সেক্রেটারীর কাছে গেলেন। আন্ডার সেক্রেটারী ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে গেলেন। ডেপুটি সেক্রেটারী যুগ্ম সচিবের কাছে গেলেন। যুগ্ম সচিব গেলেন চীফ সেক্রেটারীর কাছে আর চীফ সেক্রেটারী গেলেন মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী চীফ সেক্রেটারীকে কিছু নির্দেশ দিলেন আর চীফ সেক্রেটারী যুগ্ম সচিবকে যুগ্ম সচিব উপ-সচিবকে আর উপ-সচিব আন্ডার সেক্রেটারীকে কিছু নির্দেশ দিলেন। ফাইল চলতে থাকে-এর মধ্যে অর্ধেক দিনও চলে গেল।

দুপুরে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় সেই চাপা পড়া মানুষের চারিদিকে ভীড় বেড়ে গেলো। নানা মুনির নানা মত। কিছু কেরানী নিজেরাই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করল। বিনা হুকুমেই তারা গাছটা সরানোর পরিকল্পনা করছিলো ঠিক অমনি সুপার ফাইল নিয়ে ছুটে এসে হাজির বললেন, আমরা এই গাছ আমাদের খেয়াল খুশীমত এখান থেকে সরাতে পারব না। কারণ আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন্ আর এই গাছ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে। এই ফাইলটা আমি জরুরী মার্কা দিয়ে এখনিই কৃষি দফতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে উত্তর আসার পর আমরা গাছ সরাবো।

পরের দিন কৃষি বিভাগ থেকে উত্তর এলো, এই গাছ বাণিজ্য দফতরের লনে পড়েছে তাই এই গাছ সরানোর দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের।

ফাইলের উত্তর পড়ে বাণিজ্য দফতর চটে টং। তারাও কড়া জবাব দিল, এই গাছ সরানো বা না সরানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কৃষি দফতরের। বাণিজ্য দফতরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

পরের দিন ফাইল মুভমেন্ট শুরু হল। পরের দিনও ফাইল চলতে শুরু করল। সন্ধ্যার সময় জবাব এলো, আমরা এই সমস্যা হর্টি-কালচার বিভাগে পাঠাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ এ এক ফলবান গাছ। কৃষি বিভাগ শাক-সব্জি এবং খেত-খামারের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। জামগাছ ফলদার গাছ। সুতরাং এই ধরনের গাছের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে হর্টি-কালচার বিভাগের আওতাধীন।

রাতে মালী চাপা-পড়া লোকটিকে ডাল-ভাত খাওয়ালো। তার চারিদিকে পুলিশের কড়া পাহাড়া, কোন লোক যেন নিজের ইচ্ছা মত গাছটি সরানোর চেষ্টা না করে। কিন্তু একজন পুলিশের চাপা-পড়া লোকটির প্রতি করুণা হয়। সে মালীকে খাওয়ানোর অনুমতি দিল।

মালী চাপা-পড়া লোকটিকে বলল তোমার ফাইল চলছে, মনে হয় কালকের মধ্যে একটা ফায়সালা হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া লোকটি মালীর কথায় কোন জবাব দেয় না।

মালী চাপা-পড়া লোকটির দিকে মনযোগ দিয়ে দেখে বলল, ভাগ্য ভালো তোমার কোমরের দিকে গাছটি পড়েছে, কোমরের মাঝখানে পড়লে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যেত।

চাপা-পড়া মানুষটি কিন্তু মালীর কোন কথার জবাব দিল না।

মালী আবার বলল, তোমার যদি কোন ওয়ারিশ থাকে তবে তার ঠিকানা আমাকে বল, আমি তাকে খবর দেয়ার চেষ্টা করব।

চাপা-পড়া লোকটা অতিকষ্টে বলল, আমি নিজেই লা-ওয়ারিশ।

মালী দুঃখ করে চলে গেল।

তৃতীয় দিন হর্টি-কালচার বিভাগ খুব কঠোর জবাব দিল। হর্টি-কালচার বিভাগের সচিব অত্যন্ত সাহিত্যমোদী বলে পরিচিত। তিনি প্রাঞ্জল সাহিত্যিকের ভাষায় লিখলেন, সারাদেশে যখন আমরা বৃক্ষ রোপণ করছি, তখনই আমাদের দেশে এমন কী সরকারি আইন আছে যার বলে গাছ কাটা যায়। বিশেষ করে এমন গাছ যা ফলদার আর এই গাছ হচ্ছে একটি জাম গাছ, যার ফল সবাই খায়। আমাদের বিভাগ কোন মতেই এই জাতীয় একটি ফলদার গাছ কাটার অনুমতি দিতে পারে না।

উপস্থিত একজন রসিক লোক দুঃখ করে বলল, এখন তবে কি করা যায়? যদি গাছ কাটা না যায় তবে মানুষটাকে কেটে বের করা হোক। সে সবাইকে তার প্রস্তাবের সারমর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বলল, লোকটাকে যদি মাঝখান দিয়ে কাটা যায় তবে অর্ধেক মানুষ এদিকে আর অর্ধেক ঐদিকে বেরিয়ে আসবে। আর গাছটাও অক্ষত থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপা-পড়া লোকটা প্রতিবাদ করে বলে উঠল, কিন্তু আমি তো মারা পড়ব।

একজন কেরানী বলল, হাঁ একথাও ঠিক।

যে লোকটি মানুষটা কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি উত্তর দিলেন, আপনি জানেন না, আজকাল প্লাস্টিক সার্জারী কত উন্নতি সাধন করছে। একে যদি দু'খন্ড করে কেটে বের করা যায়, তবে প্লাস্টিক সার্জারী করে আবার জোড়া লাগানো যাবে।

এবার ফাইল গেল মেডিকেলে। মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট সাথে সাথে ফাইল একজন অভিজ্ঞ প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিল। সার্জন খুটিয়ে খুটিয়ে চাপা পড়া মানুষটার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, হার্টবিট ইত্যাদি। তারপর এক রিপোর্টে লিখলেন, লোকটার প্লাস্টিক অপারেশন হতে পারে তবে লোকটা মারা যাবে।

সুতরাং এই ফায়সালাও আর গৃহীত হলো না।

রাতে মালী চাপা-পড়া লোকটাকে খিচুড়ী খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, তোমার ব্যাপারটা উপরের মহলে গেছে। শুনেছি কাল সচিবালয়ে সচিবদের মিটিং হবে। এই বৈঠকে তোমার ব্যাপারটা আলোচনা হবে। মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাপা-পড়া লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল, জানি কিন্তু যখন তোমার কাছে খবর আসবে তখন হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাব।

মালী হঠাৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। তুমি কি তা হলে একজন কবি?

চাপা-পড়া লোকটা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

পরের দিন মালী চাপরাশিকে বলল, চাপরাশি কেরানীকে আর কেরানী হেড ক্লার্ককে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা সচিবালয়ে খবর রটে গেল গাছে চাপা-পড়া লোকটা একজন কবি। আর দেখতে দেখতে কবিকে দেখার জন্য লোকজন ভেঙ্গে পড়ল। শহরেও এই খবর পৌঁছে গেল। আর সন্ধ্যায় শহরের অলিতে গলিতে যত কবি আছে সব একত্রিত হল। সচিবালয়ের লনে কবি আর কবি। চাপা-পড়া লোকটার চারিদিকে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠানের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। সচিবালয়ের কয়েকজন কেরানী ও আন্ডার সেক্রেটারী যারা সাহিত্য চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট তারাও এসে যোগ দিলেন।

চাপা-পড়া লোকটা যে কবি, এই খবর যখন সচিবালয়ের সাব-কমিটিতে পৌঁছল, তখন তারা রায় দিলেন ঃ চাপা-পড়া লোকটার ব্যাপারে কৃষি বা হর্টি-কালচার বিভাগ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের। কালচারাল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতভাগা কবিকে চাপা-পড়া ফলদার গাছের নিচ থেকে উদ্ধার করা হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাইল কালচারাল বিভাগের এক সেকশান থেকে অন্য-সেকশানে ঘুরতে ঘুরতে সাহিত্য একাডেমীর সেক্রেটারীর হাতে গেল। সেক্রেটারী সাহেব তক্ষুণি গাড়িতে করে সচিবালয়ে এসে পৌঁছলেন এবং তিনি চাপাপড়া লোকটার ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলেন।

—তুমি কি কবি?

সে উত্তর দিল, জি হাঁ।

—কোন নামে তুমি পরিচিত?

—ওস।

—ওস? সেক্রেটারী বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল।

তুমি কি সেই ওস—যার কবিতা সংগ্রহ 'ওসের ফুল' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

চাপা-পড়া লোকটা রুক্ষ স্বরে বলল, হাঁ। সেক্রেটারী তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি আমাদের একাডেমী সদস্য?

—না।

সেক্রেটারী বললেন, সত্যিই আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এতো বড়ো কবি-'ওসের ফুলের' লেখক আমাদের একাডেমীর সদস্য নয় কতো বড় কবি অথচ অজ্ঞাত অবস্থায় চাপা পড়ে আছে।

—না, চাপা পড়ে নাই। বরং আমি স্বয়ং গাছের নিচে চাপা পড়ে আছি। দয়া করে আমাকে বাঁচান।

'এখনিই ব্যবস্থা করছি' বলে সেক্রেটারী ছুটতে ছুটতে গিয়ে নিজের দফতরে রিপোর্ট করল।

পরের দিন সেক্রেটারী সাহেব কবির কাছে এসে হাজির। বললেন, আদাব, মিষ্টি খাওয়ান আমাকে। আমাদের সাহিত্য একাডেমী আপনাকে কেন্দ্রীয় শাখার সদস্য করে নিয়েছে। এই যে আপনার সদস্যপদের চিঠি।

চাপা-পড়া লোকটা বেশ কঠোর স্বরে তাকে বলল, আমাকে তো আগে এই গাছের নীচ থেকে বের করুন। খুব ধীরে ধীরে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তার চোখ মুখ দেখে মনে হয়, সে দারুণ কষ্টে আছে।

সেক্রেটারী বললো এ ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। আমার যতদূর করার করে দিয়েছি। তুমি যদি মারা যাও তবে তোমার স্ত্রীকে পেনসন দিতে পারি। আবেদন করলে তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

কবি থেমে থেমে বলল, আমি বেঁচে আছি : আমাকে বাঁচান।

সরকারী সাহিত্য একাডেমীর সচিব হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, মুশকিল হলো কি, আমার দফতর শুধু কালচারের সাথে যুক্ত গাছ কাটাকাটির ব্যাপার তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর দোয়াত কলমে হয় না—দা কুড়ালের সাথে এর সম্পর্ক। আমি বন বিভাগকে জরুরী চিঠি দিয়েছি।

সন্ধ্যার সময় মালী এসে চাপা-পড়া লোকটাকে বলল, কাল বন বিভাগের লোক এসে গাছ কেটে দেবে, আর তুমিও রক্ষা পাবে।

মালী খুব খুশী হল। চাপা-পড়া লোকটার শরীরে আর কুলাচ্ছে না। বাঁচার জন্য আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে। কাল পর্যন্ত কাল ভোর পর্যন্ত যেভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হবে।

পরের দিন বন বিভাগের লোকজন এসে কুড়াল-দা নিয়ে হাজির-তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে খবর এলো, গাছ কাটা বন্ধ রাখার। কারণ দশ বছর আগে পিটোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের লনে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন যদি এই গাছ কাটা হয় তবে পিটোনিয়া সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

একজন কেরানী চীৎকার করে বলল, একজন মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন এতে জড়িত।

আর একজন কেরানী অন্যজনকে বলল, আরে এ যে দুই দেশের সম্পর্কের প্রশ্ন জড়িত। তুমি কি জাননা পিটোনিয়া সরকার আমাদের দেশকে কিভাবে সহযোগিতা করছে। আমরা কি বন্ধুত্বের জন্যে একজন মানুষের জীবন উৎসর্গ করতে পারি না।

—কবির মৃত্যু হওয়া উচিত

—নিশ্চয়ই।

আন্ডার সেক্রেটারী অফিস সুপারকে বললেন, আজ প্রধানমন্ত্রী সফর শেষ করে ফিরেছেন। বিকেল চারটায় বৈদেশিক দফতর থেকে গাছ কাটা সম্পর্কিত ফাইল তার কাছে পেশ করা হবে। উনি যা বলবেন তাই হবে।

বিকেল পাঁচটায় সেক্রেটারী স্বয়ং ফাইল নিয়ে হাজির। এই যে শুনছেন। তিনি খুশীতে গদ-গদ হয়ে ফাইল দোলাতে দোলাতে বললেন, প্রধানমন্ত্রী এই গাছ কাটার হুকুম দিয়েছেন। সব দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কালই এই গাছ কাটা হবে। আর তুমিও এই সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে। আরে শুনেছেন কী। আজ আপনার ফাইলের কাজ শেষ।

কিন্তু কবির হাত ছিল বরফের ন্যায় ঠান্ডা। চোখের তারা আকাশের দিকে স্থির। আর এক সারি পিপঁড়ে তার মুখের ভেতর ঢুকছিল।

তার জীবনের ফাইলও পূর্ণ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# মুবি

মুবি সেনাদলে ভর্তি হওয়ার আগে নিউইয়র্কে ওকালতি করতেন। মুবির মাথার চুল ছিল ঘন ও সোনালী। মাথার সোনালী চুলের গুচ্ছ কপালে এসে পড়তো। এমনি সোনালী রঙ এর আভা সেপ্টেম্বর মাসে নাসপতির গায়ে দেখা দেয়। মুবির উচ্চতা ছয় ফুটের কিছু বেশি। তার হাসি শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ। নাকের আগায় ছোট্ট একটা তিল। এই ছোট্ট একটা তিল মুবির চেহারায় তারুণ্যের শত আভার মাঝে সরল ও নিষ্পাপ করে তুলেছে। তাকে ছোট্ট শিশুর ন্যায় সহজ সরল মনে হয়, যে শিশুটি নাকের ডগার কলমের নিব দিয়ে কালির ফোটা বসিয়ে দিয়েছে। তাই পারভেজ তাকে "পচা মুবি" বলে সম্বোধন করতো। এ নিয়ে পারভেজ আর মুবির মাঝে ঝগড়া লেগেই থাকে। যা মাঝে মাঝে হাতাহাতির পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে।

সন্ধ্যায় মুবির স্টুডিওতে পারভেজের সাক্ষাৎ হয়। মুবি আসাম ও বাংলাদেশ থেকে ঘুরে কয়েক মাসের জন্য এখানে এসেছে। ডিসেম্বর মাসে তাকে অধিকাংশ সময় সেনানিবাসের সড়কে একলা ঘুরাফেরা করতে দেখা যেত। এখন তাকে সেনানিবাসের সড়কে একা মুখবাঁশী বাজিয়ে সাইকেল চালাতে আর ঘুরাঘুরি করতে দেখা যায়না। একা একা ঘুরাঘুরির প্রতি তার ঘৃণা ধরে গেছে। সেনানিবাসের ব্যবসায়ী লোকজনও তার পছন্দ নয়। সেনানিবাসের সিনেমা হলে সাধারণতঃ হলিউডের নগ্ন ছায়াছবিই প্রদর্শিত হয়। সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ কি সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েদের নগ্ন দেহবল্লরী ছাড়া আর কিছুই প্রদর্শন করতে পারেন না। একথা ভেবে তার দারুণ রাগ হয় আর সে সারাসপ্তাহ সিনেমা হলের ধারে কাছেই ঘেঁষে না।

আসলে সিনেমা দেখা সে পছন্দ করেনা এমন নয়। তবে হলিউডের বাছাই করা ছবি সে দেখতে চায়, যাতে সামাজিক সমস্যাবলীর চিত্র ফুটে উঠেছে। অবশ্য এ ধরণের ছবি এ দেশে কদাচিৎ প্রদর্শিত হয়। তা না হলে প্রতিবার নগ্ন উরুর অশ্লীল ছবি দেখানো হতোনা। এতে থাকে উন্মুক্ত স্তন ও দেহ প্রদর্শনী, নিতম্ব নাচানো আর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির নৃত্য। আল্লাহ্ জানেন, কবে এসব অশ্লীল ছবি দেখার কবল থেকে আমরা মুক্তি পাবো।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই সে অধিকাংশ সময় সাইকেল নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সড়কে চক্কর দিয়ে থাকে। স্টুডিওর সামনে দিয়ে সে কয়েকবার অতিক্রম করেছে, স্টুডিওর অভ্যন্তরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সে তার ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখে। তবুও তার সাধ বার বার ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। বাধা যতই কঠিন হয় সাধও তেমনি প্রবল হয়ে থাকে। জানিনা কবরে পুরুষের কি হাল হকিকত। অবশ্য বড়দিনের উৎসবের সময় মুবির অবস্থা পুরুষদের চেয়ে লাজুক ছিল। উদাস, উদ্বিগ্ন আর ভবঘুরে স্বভাব ও মেজাজ ছিল খিটমিটে সেদিন। দ্বিতীয় দফা সে স্টুডিওর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একবার সেদিকে নজর ফেলে চলে যায়। তৃতীয় দফা সে ঘুরাঘুরি করে ফিরে আসে আর ভাবে, স্টুডিওতে ঢুকতে অসুবিধা কিসের। ভারতীয়রা বিশ্বাসের যোগ্য নয়, এরা অশিক্ষিত গোলাম, কালা আদমী, অকর্মণ্য হীনমন্যতায় ভুগে সত্য কিন্তু তবুও তো এরা ছায়াছবি তৈরি করছে। কারিগরী মান এদের নিচু হতে পারে। কিন্তু ছায়াছবির সংখ্যা এবং চলচিত্র শিল্প হিসাবে হলিউডের পর ভারতের স্থান। কিন্তু এটা কেন হয়? সে কখনও ভাবেনি এদের সাথে মেলামেশা ঠিক নয়। সে শুনেছে, সিনেমার লোকেরা ধুরন্ধর আর অকৃতজ্ঞ। আর এদের কখনও বিশ্বাস করা যায় না। আর গরীব সে তো দারুণ গরীব। আমাদের বিড়াল ও সেখানকার মেয়েদের চেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়। সে যা হোক, মানুষের সাম্যবাদের দর্শন ... সে তো সঠিক। অবশ্য কালো রং ঘৃণাকে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি রাখে। আবার কিমুর চিঠির কথা মুবির মনে পড়ে। মুবি ও কিমু এমন একটি আয়না তৈরির চেষ্টা করছে যা প্রজেক্টরের উপর তুলে দিলে সাদাকালো ছবি নাচারাল রং এ চোখে ধরা দেবে। কিমুর ইহুদী ব্রেন এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করেছে।

এখন কিমু মুবির পুঁজি দিয়ে তার আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে চায়। কিমু মুবিকে লিখেছে, হিন্দুস্তানী স্টুডিও ও সিনেমা হল মালিকদের সাথেও যেন তার আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করে। যদি মুবি ভারতীয় মদ্যপ, বাবুর্চী, বেয়ারার সাথে আলাপ করতে পারে তবে ভারতীয় চিত্র নির্মাতাদের সাথে পারবে না কেন। সে তড়িৎ সাইকেল ঘুরিয়ে স্টুডিওর গেটে হাজির হয়। স্টুডিওর গেটে পাঠান দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল তাই তাকে থামতে হল। দরওয়ান প্রবেশ পত্র ছাড়া তাকে ভেতরে যেতে দিতে নারাজ। মুবির কাছে স্টুডিওতে প্রবেশের অনুমতিপত্র ছিল না আর অনুমতি পাবে বা কোথায়? ভারতীয় দরওয়ানের এত সাহস! সে গর্বভরে হুকুমের স্বরে বলল, আমাকে ভেতরে যেতে দাও। আমি স্টুডিও দেখব। কিন্তু দরওয়ান কোন মতেই রাজী হয় না। ফলে বচসা হয়। পথচারীদের ভীড় জমে। পারভেজ দেখল একজন মার্কিন সৈন্যকে ঘিরে লোকজনের ভীড়। সে তখন বারান্দায় দাড়িয়ে সিগারেট ফুকছিল। ধীরে ধীরে সে স্টুডিওর গেটে গিয়ে হাজির হয় ব্যাপার কি ভালভাবে জানার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কি ব্যাপার লালা?" সে দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে।

কান্দাহারের নাসপাতির ন্যায় ফর্সা পাঠান দরওয়ান উচ্চস্বরে জবাব দেয়, সাহেব ভেতর আসতে চায়। আমি বলছি, তোমার কাগজ কোথায়? সাহেবের কাছে কাগজ নেই। তা হলে তাকে কিভাবে যেতে দিই?

মুবি পারভেজকে বলল, "দরওয়ান বেটা বড় বেয়াদব।"

পারভেজ বলল, "স্বাধীন দেশের বাসিন্দা কিনা! এখনও গোলামী শিখেনি", অতঃপর পারভেজ পাঠানকে অনুমতিপত্র, লিখে দেয়। পাঠান দরওয়ান কাগজ হাতে নিয়ে বিড় বিড় করতে থাকে, "উখো, হাম কান্দাহারি পাঠান হ্যায়। আম কিসিসে নেহী ডরতা অ্যায়। আম কাবুল সে আয়া। হাম লোগ আপনে মুলুক মে ছাহেব লুগ তো কিয়া ছাহেব লুগ কি রেলগাড়ী কুভি গুসনে নেহি দিয়া। আওর রেলগাড়ী আয়েগা তো ছাহেব লুগ ভি আয়েগা। তুম হিন্দুস্থানী বড়া বেওকুপ হো।"

"এই অসভ্যটি কি বলছে?" মুবি জিজ্ঞাসা করে।

পারভেজ ব্যাখ্যা করলে সে হাসতে থাকে। ভালই হয়েছে, আমি নিজের হাত চেপে রেখেছি অন্যথায় একটি চড় কষে দিতাম। অবশ্য আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যে কোন অবস্থাতেই যেন কোন ভারতীয়কে থাপ্পড় না মারি।

পারভেজ বলল, সে ভারতীয় নয় বরং আফগানী।

মুবি নিজের ভুল বুঝতে পারে, বলল," আফগান? দু'টোর মধ্যে পার্থক্য কি?" পারভেজ বলল, "সে যদি ভারতীয় হতো তবে তোমার চড় খেয়েও সারাদিন তোমার জুতা ভাজ করে দিতো আর সন্ধ্যায় তোমাকে সালাম জানিয়ে বখ্সিস দাবি করতো। কিন্তু এই দরওয়ান তো আফগান। হিন্দুস্তানী ও আফগানিস্তানীর মধ্যে এই হ'লো পার্থক্য যে, আফগানদের হাতে থাকে ছুরি আর ভারতীয়দের কাছে সালাম।"

মুবি মুচকি হেসে বলল, "আমি তোমার সাথে রাজনীতি চর্চা করতে চাইনা। কিন্তু একথা বলোতো, তোমাদের স্টুডিও পাহারা দেওয়ার জন্য একজন আফগান পাহারাদার কেন রয়েছে?"

পারভেজ জবাব দেয়, " আমাদের জাতীয় রীতিই এমনি আমরা দেশের রক্ষার জন্য ইংরেজ মোতায়েন করি আর নিজের হেফাজতের জন্য আফগানী।"

"তোমরা কি নিজেদের স্টুডিওর দেখাশুনা করতে পারনা।"

পারভেজ কর্কশ স্বরে বলল, 'যদি তাই হতো তবে তোমাদেরকে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন ছিল কি?"

মুবি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, "আমি একজন মার্কিন সিপাই। আমার নাম মুবি। আমি তোমাদের স্টুডিও দেখতে চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারভেজ গর্বভরে বলল, মেজাজ নিশ্চয় ভাল। আমার নাম পারভেজ আসলে আজ স্টুডিও ছুটি। স্টুডিওর মালিক এখানে নেই। তাছাড়া আজ নাচঘরে কোন 'পাতলী কোমর' এর ....।

মুবি গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমি নৃত্য পছন্দ করি না।'

পারভেজ তাকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় তারপর বলল, 'এসো তোমাকে আমার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।' বারান্দায় অনেক লোকজন বেতের চেয়ারে বসে ব্রীজ খেলছিল। পারভেজ তাদের সাথে মুবির পরিচয় করিয়ে দেয়, "এ হল মমতাজ, এ আজরা, এ হামিদ, এ প্রকাশ, এ হল শ্যাম। এসময় আমরা স্টুডিওর গাড়ীর অপেক্ষায় আছি। ছবি দেখতে যাব।"

"কি ছবি?"

'যে কোন একটা হলেই চলবে। ভারতীয় ছবিই দেখবো। তুমি যাবে তো আমাদের সাথে।'

মুবি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল, "হাঁ, আমি আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ছবি দেখিনি। তাই ছবি দেখতে ইচ্ছুক।"

"তা হলে চল।"

গাড়ি এলে সবাই একত্রে সিনেমা হলে যাত্রা করে। হলে পৌঁছে টিকেট কেটে সবাই ঢুকে পড়ে। হলের ভেতরে বসে মুগের ভাজা, ভাজা আলু, ডালপুরি ও কাবাব খায়। তারপর চলে পান খাওয়ার পালা। মুবি প্রত্যেকবার তার পকেট থেকে টাকা বের করার চেষ্টা করে কিন্তু ওরা তাকে বাধা দেয়। ওরা বলে, "ভয় পেয়োনা। আমরা জানি, মার্কিন সৈনিকরা ধনী। আমরাও একদিন তোমার পকেট কাটব। তবে আজ নয় কারণ আজ বড়দিন।"

ছবি দেখা শেষ। সবাই মুবিকে ছবি কেমন লাগল জানতে চায়। মুবি ভদ্রতার খাতিরে ছবির প্রশংসা করে, "খুব ভাল ছবি তবে অনেকগুলি গান। গানগুলিও সঙ্গীতবহুল। এখানে কি সব ছবিই সঙ্গীতবহুল হয়ে থাকে?"

শ্যাম গর্জে উঠে, "এখানে সব ছবিই সঙ্গীতবহুল হয়ে থাকে মিস্‌তার মুবি। "সে সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে মুবির দিকে কড়া নজরে দেখতে থাকে।"

"মিসতার মিস্টার নয় কেন?" মুবি জিজ্ঞাসা করে।

"ব্যাস, যাকে আমার বেশি ভাল লাগে তাকে আমি মিস্‌তার বলেই সম্বোধন করি, বুঝলে পেত্নী।"

মুবি বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "পেত্নী কি? এর অর্থ কি?"

"অর্থ আমি বুঝিনা এসবের। তবে এসব ভালবাসার কথা বুঝলে মুবি, দুবী, চুচি মুছি।" শ্যাম মুবির সোনালী চুলে হাত দিয়ে টান মেরে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুবি খুশী হয়ে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে শ্যামের বদলে শেমী বলে ডাকব।"

হামিদ আর্তনাদ করে উঠে, "শেম শেম।"

"বেহায়া" শ্যাম হঠাৎ বলে ফেলে।

'বেহায়া' অর্থ কি মুবি জানতে চায়।

হামিদ বলল, "এ এক ধরণের গালি। এই শালার পাঞ্জা বড় তাই গালি ছাড়া তার মুখে কিছুই আসেনা। মন চাইলে নাও না হলে নিওনা।"

শ্যাম মুবির কাধে নাড়া দিয়ে বলল, " এ পূরবী ঠিকই বলেছে। কিন্তু বল, কোন চীনা রেস্তোরায় গিয়ে বড়দিনের উৎসব পালন করি তাড়াতাড়ি বল রাজী কিনা?"

"ফুটেমু" মুবি মাথার টুপি আকাশের দিকে ছুড়ে মেরে বলল, আজ থেকে আমি আমার কর্ণেলকে ডাকব, "হে বয়, হে বয় ...।"

ফুংকুং চীনা রেস্টুরেন্টের বিদ্যুতের বাল্বের ঝলমল আলোর নিচে খাবার টেবিল। আমার সামনে দেয়ালে বিরাট চিয়াং কাইসেকের পোট্রেট, চার্চিল ও রুজ ভেল্টের ছবি টাঙানো। চিয়াং এর চোখ জোড়া স্থির তবে চোখে মুখে আবেগ বিদ্যমান। রুজভেল্টকে একটি ধনী দেশের শাসক হিসাবে শান্ত ও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। চার্চিলের ঠোঁট কামড়ানো অবস্থায় চুরুট আরও শক্তভাবে দাঁতের সাথে চেপে ধরেছে। তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়, আমি শাসক আছি, থাকব। প্রকাশের দৃষ্টি চার্চিল ও ক্লেমুন্সের চেহারায় মিল খুঁজে পায়। দু'জনার দেহের গড়ন ভিন্ন হলেও চেহারায় যথেষ্ট মিল আছে। সেই প্রতিশোধমূলক আবেগ আর চিতার ন্যায় সাহস। ক্লেমুন্সও ফ্রান্সের 'চিতা', নামে খ্যাত ছিল। প্রকাশ এই ছবি দেখে বার বার থেমে যেতো। হঠাৎ মনে হল তার চোখ আর কারও ছবি দেখতে ইচ্ছুক। কিন্তু কাকে? আজ বড়দিন। মিত্র পক্ষের পতাকা বাড়ির ছাদের দেওয়ালে সর্বত্র উড়ছে। প্রকাশের দৃষ্টি অন্য একটি পতাকা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কাকে ? সে ছবি তো এখনও তৈরি হয়নি এবং পতাকাও নয়। প্রকাশ ভাবে তার মনের সন্দেহ ও আবেগ কেন বেড়ে চলেছে। সে চীনা রেঁস্তোরার কর্মচারী, মার্কিন ও কানাডীয় সুন্দর পাইলটদের চোখে মুখে গর্বের রেশ দেখতে পায়। চীনা রেস্তোরাঁর ম্যানেজার হাতে কাগজ কলম নিয়ে অর্ডারের অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে। লোকটির দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মাঝেও প্রকাশ গর্বের ঝিলিক দেখতে পায়। এটা চোখের ধাঁ-ধাঁ নাকি মানসিক বৈকল্য?

শ্যামও নীরব। পুরো মজলিসে কোন কথা নেই। সবাই নীরব। মুবি নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, এই রেস্তোরাঁর ভাজা চিংড়ি আমার খুব পছন্দ। তোমার পছন্দ নাকি শেমী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যাম চীৎকার করে উঠে, "অবশ্যই"। তারপর একটি 'চিংড়ি' তুলে মুখে পুরে দেয়। তারপর চারিদিকে তাকায়। একমাত্র তার টেবিল ছাড়া অন্যকোন টেবিলে ভারতীয় লোক ছিলনা। এখানে স্বদেশী অনেক কম, সে ভাবতে থাকে। আবার ভাবল, এখানে ভারতীয় কোথায়? ওরা তো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র মাদ্রাজে ভুখা—না খেয়ে মরছে ধুকে ধুকে।

প্রকাশ আলাপ জমানোর চেষ্টা করে, "চীনা চিপসে আমেরিকান চিপসের মতো স্বাদ নেই।"

"হামিদ বলল, হাঁ ... এতে খাদ্যপ্রাণও কম।"

মমতাজ বলল, "আমার আমেরিকান চিপস বেজায় পছন্দ।"

মুবি খুশী হয়ে বলল, "ধন্যবাদ। আমি একে বড়দিনে সেরা ' টোস্ট' মনে করব"

দু'জন কানাডীয় বৈমানিক পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে যায়। মুবি তাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় আর তড়িৎ উঠে তাদের দিকে এগিয়ে যায়।

"এ হল জন, এ হল টম। দু'জনেই মন্ট্রিল থেকে এসেছে। মুবি তার ভারতীয় বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিচয় পর্ব শেষে দু'জনই টেবিলে বসে পড়ে। "আমরা কিছুই খাবনা," টম বলল। আমরা এক্ষুণি .....।" তারপর সবাই চুপ। চীনা সঙ্গীতে বাজছিল।

মুবি বলল, "জন বড়দিনের উৎসব অথচ আমরা দেশ থেকে অনেক দূরে ....।" জন নীরব।

টম বলল, "পাহাড়ের চূড়ায় বরফপাত দেখতে ইচ্ছা করে। বাইরে নজর ফেরালে রাতের আকাশে মিটি মিটি তারা জ্বলতে দেখা যায়।"

জন বলল, "বেয়ারা এক গ্লাস পানি নিয়ে এস।"

মুবি বলল, "তোমার মা বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিশ্চয় ছোট ভাইবোনেরা আছে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর আমি ছাড়া মার কেউ নেই। জীবনের প্রথম থেকে আমি মার কাছেই থাকতাম। মাঝে মাঝে মায়ের স্মৃতি মনে পড়লে আমাকে উদাসীন করে তোলে।"

টম বলল, "এখন নিশ্চয় বাড়িতে মুমি শামী আছে।" বড়দিনের বৃক্ষ এবং বাইরে গলিতে একর্ডিয়ানের মধুর সুর তার শুনতে মন চায়।

মুবি বলল, " আমি এইসব বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আজকের দিনে।" সে নীরব হয়ে যায়।

জন আলাপের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে বলল, "পারভেজ সাহেব আপনার বেতন কত?"

"আট'শ টাকা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাস", জন পারভেজের উত্তর শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে। "আমাদের দেশে একজন খনিজ শ্রমিকও আট'শ টাকা বেতন পায়।"

হামিদ বলল, "এখানে এই বেতন অনেক বেশি। ভারতের মাথা পিছু দৈনিক আয় মাত্র ছয় পয়সা।"

মন্ট্রিলের বৈমানিক বলল, "সত্যিই অত্যন্ত গরীব দেশ। মুবি, তুমি কি ক্যাম্পে ফিরে যাবে।"

"এখন নয়। আমি একটু পরে যাবো। তুমি চলে যাও।"

দু'জন কানাডীয় বৈমানিক 'গুড নাইট' বলে বিদায় নেয়। এরপর মুবি বিল আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। অবশ্য শ্যাম তাকে তিরস্কার করলে সে নিবৃত হয়। বিল আদায়ের পর বাইরে এসে পারভেজ, প্রকাশ, হামিদ, আজরা ও মমতাজ বিদায় নেয়।

শ্যাম ও মুবি দু'জন রয়ে গেল। দু'জন সড়ক দিয়ে হেঁটে চলছিল। ইংরেজী ছবির সিনেমা হলগুলির পাশ দিয়ে ওরা অতিক্রম করছিল। বাতাসে মাদকতা আর লোকজনের দেহ থেকে বেরুচ্ছে সেন্টের সুগন্ধ আর মুখে ইংরেজী গানের সুর। নওশেরওয়ান এ্যাণ্ড কোম্পানী মদের দোকানে লাউড স্পীকার বাজছিল আর একজন সৈনিক সঙ্গীদেরকে ঈশা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার মন্ত্র পড়াচ্ছিলেন।

"আমরা সবাই পাপী-তাপী। এসো সকলে মিলে ঈশা (আঃ)-এর পদতলে আশ্রয় নিই।"

শ্রোতাদের মাঝে মার্কিন, কানাডীয়, ইংরেজ ও অস্ট্রেলীয় সৈনিক ছিল। এরা চৌরাস্তা দিয়ে পথ চলতে গিয়ে এখানে ভীড় জমিয়েছিল। আর কিছুক্ষণ পর একে একে সবাই নিজ নিজ পথে চলে যাচ্ছিল। তিন-চারজন ভারতীয় বেয়ারা মনযোগ সহকারে এই উপদেশবাণী শুনছিল আর মাদ্রাজী ভাষায় নিজেদের মধ্যে চুপিসারে আলাপও করছিল। একজন ভিক্ষুক, একজন খোড়া আর একজন চাপরাশী হাতে শিকলে বাঁধা কুত্তাসহ বক্তৃতা শুনছিল অতীব মনযোগ দিয়ে।

"পবিত্র ঈশা (আঃ)-এর পদতলে ঝুকে পড়ো। আমরা সবাই তার ভেড়া।"

শ্যাম জিজ্ঞাসা করে, "ভেড়া নাকি ভেড়ার দল।"

মুবি বলল, হয়তো তুমি যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করছ। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমার দ্বিমত নেই-কিন্তু আমার মতে মানুষের উন্নতির স্বার্থে রক্তপাত যুক্তিসঙ্গত।

"কার আগমনী?" শ্যাম জানতে চায়। 'একেতো ধনী লোকের আগমন আর দ্বিতীয়তঃ গরীবের আগমন। শ্বেতাঙ্গের জন্ম আর কৃষ্ণাঙ্গের জন্ম। সবাই মানুষের অগ্রগতির কথা চিন্তা করে। তবে দু'জনের চিন্তা ভাবনা পৃথক পৃথক হতে বাধ্য। আমার মনে হয়, এটা যুদ্ধ নয় বরং দু'টি স্বপ্নের লড়াই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ঠিকই বলেছ', মুবি উত্তর দেয়। "কিন্তু এটাতো কালো ও সাদা লোকের স্বপ্নের লড়াই নয়। আমরা তো এই স্বপ্নের বিরুদ্ধে লড়ছি যারা যুদ্ধ বিবাদের ইজারাদার বলেছে। সেই স্বপ্নতো মুসোলিনী ও হিটলার দেখেছে, একজন কালা আদমী আর একজন সাদা। অতএব তোমার যুক্তি ভুল।"

'আমি জানি এই স্বপ্ন মারাত্মক আবার একে ঘৃণাও করি। কিন্তু তুমিও যে এই স্বপ্ন দেখছোনা তার প্রমাণ কি?"

মুবি গর্বভরে বলল, এর প্রমাণ আমাদের আমেরিকার ইতিহাস। "ইংরেজরা গণতন্ত্র প্রিয় আর রুশরা সমাজতন্ত্রের পূজারী। চীনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন সানইয়াত সেন আর আমাদের ভাগ্য তো একেবারে ফর্সা।"

'আর ভারত' শ্যাম উপহাসের স্বরে বলল। "যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের পটভূমিকায় তোমাদের ভাগ্যও কংক্রিটের তৈরি। এতে কোন চারিত্রিক গুণাবলীর প্রভাব পড়তে পারে না।"

মুবি বলল, আমি এই দেশে তোমাদের অতিথি। তোমাদের সরকারের অতিথি। এই দেশের হালহকিকত আমার বিশেষ জানা নেই। তাছাড়া রাজনীতির প্যাচানো সমস্যা সমাধানও সম্ভব নয়। তবে এইটুকু জানি যে, ইতিপূর্বে আমি বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষে হাজারো লোকদের তাদের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনের সামনে মরতে দেখেছি। সে দৃশ্য দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কারণ কেউ কাউকে সাহায্য পর্যন্ত করতে পারছিল না। কারণ তাদের হাতে খাবার ছিল না আর চোখে ছিল না অশ্রু। এদের মতো পাষাণ হৃদয় আমি কোথাও দেখিনি। এটাই কি জাতীয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয়েছে শেমি, যেন এটা একটি দেশ নয় কয়েকটি জাতি, এক ভাষা নয় কয়েকটি ভাষা, একটি কালচার নয় কয়েকটি কালচার আর প্রত্যেকটি একে অন্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য।"

শ্যাম জিজ্ঞাসা করে, "তোমার মতামত কি? বাংলাকে সাহায্য কে করেছে? কয়েক লাখ টাকা নাকি শস্যের কয়েক বস্তা সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে সরকারের নামে জনগণের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এসব বাংলার দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। এসব সাহায্য তো আটায় লবণের সমতুল্য অর্থাৎ সাগরে বিন্দুর মতো। বাংলাকে বাঙালীরাই বাঁচিয়েছে, অন্যথায় একজন বাঙালীও তোমার নজরে পড়তো না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ছিল প্রচণ্ড ..... কিন্তু সাহায্যেরও তো একটা সীমা আছে। যারা মৃত্যুর দ্বারে উপনীত তারা অন্যকে কি সাহায্য করবে? তোমাদের লোকজনের মাঝে স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান। প্রাচুর্যের আতিশয্যে অতিষ্ঠ হয়ে তোমরা সাথীদের সাহায্য করে থাক। তাদের বিপদে অশ্রু বর্ষণ করো। কিন্তু যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরীবের কাছে নিজেরই খাবার নেই সে অন্যের সাহায্য করবে কিভাবে? আর চোখের পানি? এক পর্যায়ে গিয়ে চোখের পানিও শুকিয়ে যায়। আসলে চোখের পানিও রুটি থেকে সৃষ্টি। পেটে যার রুটিই পড়ে না সে অন্যের জন্য চোখের পানি কিইবা ফেলবে? আমরা শুধু একটি জাতি নই, এমনি অনেক জাতি আছে। ইউরোপে এমন অনেক জাতি আছে যারা অন্নহীনদের সাহায্য দানে প্রস্তুত কিন্তু আমাদের বেলায় কেউ নেই। বলকান দেশ বিশেষতঃ গ্রীসে দুর্ভিক্ষের দারুণ দাপট, সেখানে মিত্র পথ কিভাবে অতিকষ্টে খাদ্য পৌছিয়েছিল। আর আমরা এখানে গমের বস্তা ভিক্ষা করলে এর বদলে আমাদের ভাগ্যে জুটে হুইস্কির বোতল?"

মুবি হেসে বলল, "আমি কান দিয়ে শুনছি।"

"এর অর্থ কি?"

"সব শুনছি। ব্রেনে গেঁথে নিচ্ছি কিন্তু কোন মন্তব্য করছি না।"

"কেন?"

"আমাদের প্রতি নির্দেশ আছে। সবকিছু শুনবে কিন্তু মুখে কিছু বলবে না। বিশেষতঃ খাদ্য শস্য নিয়ে ...। আমার একটি আর্কষণীয় ঘটনা মনে পড়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, ভারতীয়দের কাছ থেকে কোন উপহার নেবে না। আর যদি উপহার নাও তা অবশ্যই কম দামী হতে হবে।।"

"কেন?"

"কারণ আমি শুনেছি, ভারতীয়দের রীতি হল, একটি ছোট্ট উপহার দিয়ে অনেক বড় পুরস্কার অর্জন করা।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সে নীচু স্বরে বলল, "একথা সত্যি, কিন্তু এ ধরণের নির্দেশ আজ থেকে দেড়শ বছর আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দেয়া হতো। আমরা উপহার দিতে গিয়ে নিজের বসতবাড়ী পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। এতে আমরা কতখানি উপকৃত হয়েছি তা সারাবিশ্ব জানে, ইতিহাসে সাক্ষী আছে। ভারত কখনও কাউকে লুণ্ঠন করেনি। সে নিজেই লুণ্ঠিত হয়েছে সব সময়। ভারতীয়রা আজ পর্যন্ত কখনও দেশের বাইরে গিয়ে কোন জাতিকে লুণ্ঠন করেনি?" আজকাল সভ্যতার ধারকবাহকদের পক্ষ থেকে আমাদের দুর্নাম করা হয় অথচ এরাই রেডইণ্ডিয়ানদেরকে .... তাদের নিজস্ব আবাসভূমি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছেন। তখন তাদেরকে কোন নির্দেশনামা দেয়া হয়নি কেন?"

মুবি উদ্বেগের সাথে বলল, "তাহলে তুমি কি চাও।"

"যা কিছু তোমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ইউরোপের জন্য প্রস্তাব করে থাকো তাহল আজাদী ও রুটি। আমাদের জন্য শুধুমাত্র স্বাধীনতা—রুটি নিজেরাই উৎপাদন করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আজাদী দেওয়া যায় না অর্জন করতে হয়", মুবি উত্তর দেয়।

'তাহলে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ইউরোপকে কেন তাদের ভাগ্যের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় না। তাদের নিজেদের রোগের চিকিৎসা নিজেদেরকে করতে দাও।'

"এটা তোমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। এতে আমরা নাক গলাতে পারি না।"

"এই ব্যবস্থা ইউরোপীয় দেশগুলির ব্যাপারে অনুসৃত হওয়া উচিত। তোমাদের প্রশাসনিক কাঠামো হয়তো জোরদার হবে কিন্তু নীতিগতভাবে তা সঠিক নয়। কেননা মানবসমাজ একটি দেহ স্বরূপ। একটি পায়ে আঘাত লাগলে ব্রেন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে না। হয়তো তখন তুমি এই সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে না। আটদশটি যুদ্ধ শেষ হলে বুঝতে পারবে শান্তি ও যুদ্ধের ন্যায় মানুষের আজাদীর প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকল মানুষের সাথে একত্রিভূত হচ্ছি না ততক্ষণ পর্যন্ত আদম সন্তান। আমরা অবশ্যই গোলাম থাকব কিন্তু তোমরা প্রতি পঁচিশ বছর অন্তর তোমাদের যুব সমাজের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। প্রতি পঁচিশ বছর অন্তর নববধূদের তোমরা বিধবায় রূপান্তরিত করবে। আর শিশুদের এতিম করে ছাড়বে। তোমাদের রাজনীতিকরা যাকে বুদ্ধিমত্তা বলে ধরে নেন আসলে তাকে আত্মহত্যাই বলব।"

মুবি হেসে বলল, "টম ঠিকই বলেছিল। কোন শিক্ষিত ভারতীয়দের সাথে আলাপ করো না। কারণ ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজনীতির আলোচনা করবে।"

শ্যামের স্বর নরম হয়ে আসে সে লজ্জা পায়, আর মুবিকে বলল, "আচ্ছা তাহলে বলো, কি নিয়ে আলাপ করবো।"

মুবি চীৎকার করে উঠে "ফুটে মু।"

শ্যাম ও মুবি দু'জনেই হাসতে থাকে আর তক্ষুণি গম্ভীর পরিবেশের রেশ কেটে যায়।

শ্যাম মুবির কাঁধে হাত রেখে বলল, "তাহলে এসো .... প্রেমের আলাপ করি; প্রথমে আমি আমার প্রিয়ার কাহিনী শুনাই। তারপর তুমি বলবে। তবে শুন, তার নাম ছিল রমু—।"

শ্যামের দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। সে তার প্রিয়ার নাম উচ্চারণ করতে গেলে দূর নীলিমায় যেন হারিয়ে যায়। প্রিয়ার নাম নিতেই তার কণ্ঠস্বরে এমন এক মাধুর্যের সৃষ্টি করে যা সে শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করে। সে দেখতে পায়, রাত ক্রমশঃ গভীর হতে চলেছে, আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। রাত যেন সুগন্ধিতে সুরভিত আর মুগ্ধ সে অনেক দূরে মাটির গহ্বরে লুকিয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুবি তার শ্রান্ত বাহু শ্যামের কাঁধের উপর ধীর গতিতে রেখে দেয় আর আস্তে আস্তে বলতে থাকে তার কাহিনী। শেমী একবার তোমার প্রেমিকার নাম উচ্চারণ করো, যেন তোমার অধর প্রিয়ার নাম চুম্বন করতে পারে।

'বেয়ারা, বেয়ারা'।

শ্যাম মুচকি হেসে মুবির হাতে জোরে চাপ দেয় আর দু'জনে পাশাপাশি চলতে থাকে। দুই বন্ধু একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে, গাছের ছায়াপথ দিয়ে আবছা অন্ধকারে যেন তারাভরা রাতে আকাশের দুইজন সর্বশেষ যাত্রী।

ভিটল ওয়াড়ীতে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে হামিদ ও আজরা মুবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

দীর্ঘদিন পর মুবির সাথে এদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তার গায়ের রং আরও গাঢ় ফর্সা রূপ ধারণ করেছে এবং ঘাড়ে ও চেহারায় ভাজ পড়েছে।

হামিদ অর্থপূর্ণ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, "বিড়াল পালছ নাকি?"

মুবি হেসে কুটিকুটি বলল, "নিউইয়র্কে এক বিড়াল আছে। তাকে পাওয়ার আশায় আছি, তারই আচড়ের দাগ আমার দেহে।"

'আজকাল কি সে জুডো শিখছে?' পারভেজ জানতে চায়।

"না শিখছে না। দীর্ঘদিন আগে সে জাপানে শিখেছিল।"

"বক্সিং ও জুডোর মাঝে তোমার কাছে কোনটা শ্রেষ্ঠ?" পারভেজ জিজ্ঞাসা করে। জুডোতে শরীর চর্চা আর বক্সিং-এ সরাসরি মোকাবিলা। জুডোতে সুযোগ সন্ধানী ও কৌশলগত দক্ষতা কাজে লাগানো হয়। মুবি হাতের আঙ্গুলে গণনা করে বলল। "এই দু'টি খেলা দু'টি পৃথক জাতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। প্রকাশের মন্তব্য।

পারভেজ বাধা দিয়ে বলল, "তবুও তুমি কোনটা অধিক শ্রেয়ঃ মনে কর।" আজরা বলল, "তুমি মুবির কাছে জানতে চাও, সে কোনটা পছন্দ করে, আমেরিকা না জাপান।"

এবার সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

হামিদ বলল, " জুডোতে মূলতঃ খেলা হয় পায়ের প্যাচ। খেলোয়াড় প্রতিপক্ষকে পায়ে ল্যাং মেরে কাবু করে ফেলে আর ধরাশায়ী করে। আসলে এ পৃথিবীতে ল্যাং মারা একটি বিরাট জিনিস গ্রীসের একজন দার্শনিক বলেছে, যদি ধরার বুকে কেউ ঠিকভাবে এই জুডোর মারপ্যাচের মাধ্যমে কাউকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে তবে সব ঠিক।"

প্রকাশ বলল, "জাপানীরা এটাই চেষ্টা করছে। কিন্তু জানে না যে, প্রতিপক্ষকে ল্যাং মেরে ঘায়েল করতে হলে কিরূপ শক্তির প্রয়োজন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুবি বলল, "এই শক্তি বক্সিং থেকেই অর্জিত হয়।" আবার সে আলাপের বিষয় পরিবর্তন করে বলল, "আজরা বোন, সেদিন দাদরা হলে বাংলার দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের জন্য যে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

"তুমি কোথায় বসেছিলে, মমতাজ অভিযোগের সুরে বলল।"

"চতুর্থ সারিতে বসেছিলাম, আমার কর্ণেলও আমার সঙ্গে ছিল।'

শ্যাম চীৎকার করে বলল, "মুক বন্ধ।"

মুবি হেসে হাত তুলে বলল, "তোমরা জান শেমী, আমার কর্ণেল আমার কাছে 'ফুটেমু' বাক্য শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। তাই তিনি আমাকে জুডো গ্রুপের অফিসার নিযুক্ত করেন। জানো সেদিন তোমার খেলা দেখে তিনি কি মন্তব্য করেছিলেন? তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ওহ বয়, ওহ বয় আমার জানা ছিল না ভারতীয় নাটক এত উঁচুদরের ও বাস্তবমুখী। তিনি আরও বলেছেন, এখন আমি নিয়মিত ভারতীয় ছবি দেখব।" আমরা আনন্দের আতিশয্যে গতকাল শকুন্তলা দেখতে গিয়েছিলাম। যা হোক আসলে আজরা বোনের নৃত্য ছিল নাটকের প্রাণস্বরূপ।"

শ্যাম মুবিকে ব্যঙ্গ করে বলল, "আমাদের কোন উল্লেখও নেই পেত্নী কোথাকার। তুমি জান কি আমি নাটকের প্রযোজক ছিলাম।"

'ফুটেমু' মুবি তাকে রাগানোর জন্য বলল। শ্যাম তার দিকে এগিয়ে গেলে মুবি সেখান থেকে উঠে পালায়। শ্যামও তার পিছু নেয়। গাছের তলায় দু'জন হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। মুবি জুডোর প্যাচ মারে আর শ্যাম বক্সিং-এর আশ্রয় নেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুবি নিচে আর শ্যাম উপরে। আবার দু'জনে হাসতে হাসতে কাপড়-চোপড় ঝেড়ে নিয়ে উঠে।

প্রকাশ তাকে বুঝাতে থাকে, "শুন মুবি জুডো কোনো কাজের নয়।"

শ্যাম বলল, "বন্ধু কুস্তি শিখে নাও। কর্ণেলকে বলো তার সৈন্যদের যেন কুস্তি শিখায়, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। ভারতীয় কুস্তির সাথে বক্সিং বা জুডো কোনটাই চলে না।"

"কিন্তু এই কুস্তি তো তোমার দেশের কোন কাজে আসেনি।" মুবির কণ্ঠে বিদ্রুপের সুর। সে দেখলো, তার মন্তব্য সকলের বুকে বিঁধেছে আর ভারতীয় সকলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

শ্যাম কিছুক্ষণ আগেও হাসিখুশি ছিল এখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মুবি আন্তরিকতার সাথে বলল, "আমি দুঃখিত। সত্যিই দুঃখিত। আসলে আপনাদের মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না।"

আজরা ধীর কণ্ঠে বলল, "বসো, এখন সবাই চা খাও। তারপর নদীর তীরে গিয়ে বসব। তারপর পারভেজের কাছে গান শুনব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা খেতে খেতে মুবি বিটল ওয়াড়ীর মনোরম আবহাওয়া ও সুন্দর পরিবেশের স্বাদ নিজের চেতনায় একত্রীভূত করার চেষ্টা করে আর অতীতের স্মৃতিভার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে সে অতীতের স্মৃতিভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিটল ওয়াড়ীর মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে থাকে।

এই মন ভোলানো সৌন্দর্যে বিষ ছিলনা, ছিলনা মাদকতা বরং এতে ছিল এক সহজ ও নিষ্কলুষ আনন্দের হাসির মতো সরল ও সঞ্জীবনী জীবন শক্তির প্রেরণা। ওরা সকলে আম গাছের ছায়ায় শিকড়ের কাছে মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে পড়ে। ডুমুর ফুলের গাছের সারি আর সে গাছের ফুল বহতা নদীর পানিতে সুন্দর জ্বলজ্বলে বাতির ন্যায় দেখাচ্ছিল। পানির স্রোত যেন সঙ্গীতের সুরে ফুলের পাশে খেলতে খেলতে ঢেউ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তার আজরার নাচের দৃশ্য মনে পড়ে। বড়দিনের উৎসবে মোমবাতির আলোতে মেডোনার হাসি আর আজরার নৃত্য অপূর্ব ছিল। জানিনা কেন ভারতীয় মেয়েদের চেহারা তার কাছে মেডোনার মত মনে হয়। এখানকার মাটি আর মানুষ যেন তার অতি পরিচিত। এই মাটি, এই সবুজ শ্যামলিমা, নদী, নীল পাহাড়ের চূঁড়া যেখান থেকে কুমারী মেয়েরা কলসী কাখে দল বেঁধে চলেছে জল আনতে নদীর ঘাটে। এটা জেরুজালেম হোক বা বিটল ওয়াড়ী। মন্দিরের সোনালী কলস আর ত্রিশুল তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ত্রিশুল তো আসলে শুলী। আসলেই তাই।

নদীর তীরে মন্দির। আর নদীতে কমনীয়তা ছড়িয়ে আছে। ঐযে কিষাণ নদীর তীরে মাঠে চাষ করছে সে নিশ্চয় মন্দিরটিকে অনেকদিন যাবত চেনে আর জানে। জানা সত্ত্বেও হয়তো অনেক অজানা রয়ে গেছে তার কাছে। মানুষ ও মাটির ছবি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম। এতে আছে সবুজ ও পানির সমারোহ। হাল আছে আর হাল চষে সোনা ফলে। পূজা পার্বনের জন্য রয়েছে মন্দির। এই নিষ্পাপ ছবির মতো জীবনে কেন রক্তের স্রোত প্রবাহের অপচেষ্টা চলে। কেন?

পারভেজ বলল, "মুবি, যখন নদীর তীরে আমি এই মন্দিরটি দেখতে পাই তখন আমার পূজা করতে মন চায়।"

মমতাজ প্রশ্ন করে, "কার পূজা করবে?"

মুবি চীৎকার করে উঠে, "ওহ শেমী, শেমী বয় এদিকে এসো। এখানে প্রেমলীলা চলছে।"

শ্যাম তখন একটু দূরে ঝোপের কাছে পাহাড়ী ফুল তুলছিল। সে রুমালে অনেক ফুল নিয়েছিল।

কাছে এসেই রুমাল থেকে ফুলগুলি পারভেজ ও মমতাজের মাথার উপর ছিটিয়ে দেয়। মুবি তাড়াতাড়ি মমতাজ ও পারভেজের দু'হাত হাতের মুঠোয় নিয়ে পাদরীর বিয়ে পড়ানোর মতো বাইবেল থেকে পড়তে শুরু করে। মমতাজ তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিলে সবাই টানতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারাঠী মেয়েরা মাটির কলসী কাখে কোমর দুলিয়ে মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে যায় আর তাদের শাড়ির আচল যেন ময়ুরের পেখমের ন্যায় শূন্যে নেচে বেড়াচ্ছিল।

প্রকাশ আক্ষেপ করে বলল, মেয়েরা যখন মুচকি হাসে তখন ফুলের শিশির যেন চিকমিক করেছে আর ফোয়ারার পানি যেন গান গায়।

হামিদ বলল, "তুমি একজন উল্লুক। মেয়ে কি কোথাও নেই। এতো পুরুষের কল্পনা।"

আজরা কড়া নজরে হামিদের দিকে তাকায়, "মেয়েরা মাটির কলসী মাথায় নিয়ে ঘাটের উপর দিকে উঠছে আর তাদের গানের আওয়াজ শুনা যায় দূর থেকে। ঘাটের ধারে মেহেদী গাছের সারি। এই মেহেদী মেয়েদের বিয়ে শাদীতে ব্যবহৃত হয়। বিটল ওয়াড়ীর পুকুর অমৃত সম, এখানকার জমিতে চিনি মিশানো তবে বিটল ওয়াড়ীর ইক্ষু মিষ্টি হবেই। আবার এখানকার কুমারী মেয়েদের গলার সুর মিষ্টি না হয়ে যাবে কোথায়। বিটল ওয়াড়ীর প্রশংসা করল কারণ বিটল ওয়াড়ী এখানকার সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম।"

প্রকাশ যখন মেয়েদের এই গানটি শুনায় তখন সে লাফিয়ে উঠে বলল, "শেমী, যদি আপত্তি না থাকে তবে এই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আমি কলসী কাখে পানি নিয়ে যাওয়া মেয়েদের ছবি তুলব।"

'কেন?' শ্যাম জিজ্ঞাসা করে।

"আমরা যে সমাজে থাকি, তুমি জাননা এ দৃশ্য আমার জন্য কি অপূর্ব।" মুবি উত্তর দেয়।

শ্যাম তাকে অনুমতি দেয়। মুবি ক্যামেরা ঠিক করে এবং ধীরে ধীরে ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকায়। কিছুক্ষণ সবাই নীরব আর ঝোপের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদিকে ঘাটে মেয়েদের গীতের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর ঝোপের আড়াল থেকে মুবি মাথা তুলে আর সাপ সাপ বলে চীৎকার করে ঝোপের ভেতরে পড়ে যায়। সবাই চীৎকার করে সেদিকে এগিয়ে যায়। সাপ সাপ বলে চীৎকার করে উঠে সমস্বরে। পাহাড়ী মেঠো পথ দিয়ে মেয়েরা যাচ্ছিল, তাদের যাত্রা থেমে যায় আর সকলে নিচে নেমে আসে।

মুবি সাপের মস্তক চূর্ণ করে দিয়েছে কিন্তু তার চেহারা নীল আকার ধারণ করেছে। মুবি বলল, সাপটি আমাকে পায়ে ও হাঁটুতে কামড় দিয়েছে। তার সারা শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে।

শ্যাম ক্যামেরার বাক্সের চামড়ার ফিতা ছিড়ে মুবির হাঁটুর উপর কষে বেঁধে দেয়। মমতাজ তার ওড়না শ্যামের হাতে দিয়ে বলল, "তাকে পিয়াজ খেতে দাও" একথা বলে সে দৌড়ে গিয়ে তাদের মাল সামগ্রীর মাঝে পিয়াজ খুঁজতে থাকে পাগলের ন্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলসীধারী এক মেয়ে বলল, "এর তো শেষ অবস্থা হায় কি হবে।"

হামিদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "এখন একটা গাড়ী পাওয়া গেলে ভাল হত।"

প্রকাশ বলল, "মোটর তো সন্ধ্যা সাতটার আগে আসবেনা।"

গাঁয়ের আর একটি মেয়ে বলল, "এর তো শেষ অবস্থা। আর হয়তো পাঁচ মিনিট বাঁচবে।"

মুবির অবস্থা প্রতি মুহূর্তে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একজন শীর্ণকায় তরুণী আর্তনাদ করে এগিয়ে যায় আর মাথার উপর থেকে কলসী নামিয়ে রেখে মুবির পায়ে সাপের কামড়ের চিহ্ন কোথায় মনযোগ সহকারে দেখতে থাকে।

মেয়েটি কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঝুকে পড়ে পায়ের গোড়ালীর সাপের দংশনের জায়গায় মুখ লাগিয়ে দেয় আর চুষে বিষ তুলে নিয়ে থুথু করে মুখ থেকে বিষাক্ত রক্ত ফেলে নিতে থাকে। সমবেত সকলে বুঝতে পারেনি মেয়েটি কি করছে। একবার দু'বার .... কিন্তু মুবি তার পা সরিয়ে নিতে চাইলেও মেয়েটি ছাড়ছেনা। তৃতীয় বার মুখ দিয়ে রক্ত চুষে নেওয়ার পর মুবি উঠে দাঁড়ায় আর তার পায়ের ধাক্কার মেয়েটির কলসী উল্টে গিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে পড়ছিল। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে কলসীর পিছু নেয় আর নদীর তীরে গিয়ে কলসীটি ধরে ফেলে। সেখানে মেয়েটি পানিতে কুলি করে আর একটি গাছের লতা ছিড়ে খায়। তারপর কলসীতে পানি ভরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে।

মুবি তাকে জিজ্ঞাসা করে, "শুন, তোমার নাম কি?"

মেয়েটি থমকে দাঁড়ায় আর তার দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে।

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে আচলে মুখ ঢেকে নেয়। অপর একটি মেয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, "তার নাম মোহনী, তবে সে বোবা।" সে হাসছিল আর মোহনীর দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে।

"আমি তার মা বাবার সাথে দেখা করতে চাই।"

মুবির প্রত্যাশা প্রকাশ পায়।

সঙ্গী মেয়েটি বলল, তার মা বাবা মারা গেছে। সে এখন চাচার বাড়িতে থাকে।

মুবি শ্যামকে বলল, এই মেয়েটিকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

"চুপ করো পেত্নী কোথাকার।" শ্যামের জবাব।

মেয়েরা তাড়াহুড়া করে এগিয়ে যায় আর মুবি সেখানেই অনেকক্ষণ হতবাক দাঁড়িয়ে থাকে।

হাসপাতালে ডাক্তার মুবিকে বলল, "ভালই হয়েছে মেয়েটি চুষে তোমার বিষ ফেলে দিয়েছে নচেৎ তুমি প্রাণে বাঁচতে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু আমি সাপদংশন থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতে এসেই ইনজেকশান নিয়ে নিয়েছিলাম।"

"কিন্তু সেই ইনজেকশানে এই সাপের বিষ নষ্ট করার অনুপান ছিলনা।" ডাক্তার এই ছোট্ট মৃত সাপটি ভালভাবে পরীক্ষার পর বলল, "যাও, এখন তোমার কোন ভয় নেই।"

মুবির মুখে একটি নাম উচ্চারিত হল "মোহনী"।

"চুপ করো পেত্নী কোথাকার।" শ্যাম বলল।

সন্ধ্যায় ব্যারাকে ফিরে মুবি খবর পেল, জাপানীরা আসামে হামলা চালিয়েছে। তাকে আসামে পুনরায় তলব করা হয়েছে। কাল সকালেই তাকে আসাম যেতে হবে। প্রকাশও সেনাদলে ভর্তি হয়েছে। সেও কাল আসাম যাচ্ছে।

মজলিসে সকলে উদাস। মমতাজের চোখ মুখ রক্তিম আকার ধারণ করেছে। হামিদ আজ সিগারেটের বদলে চুরুট খাচ্ছে, আজরা বোনের চোখ জোড়া সজল হয়ে উঠেছে।

মুবি ছিল সর্বদা মুখর, আজ সে চুপচাপ। পারভেজ সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, "তোমরাতো পার্লহারবারের জন্য লড়ছ আর প্রকাশ কেন লড়াইয়ে যাচ্ছে?"

শ্যাম বলল, হয়তো আজ আমার গায়েও খাকি পোষাক থাকতো কিন্তু মনে সে উৎসাহ নেই; উত্তেজনা নেই যে নিজের গোলামীর প্রতিশোধ কার উপর থেকে নেবো। জাপানীদের উপর। জাপানীরা ফ্যাসিবাদী তাই বৃটিশ এদের উপর প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। বুঝা বড় মুস্কিল । মুবি ঠিক ঠিক বলো, তুমি কেন লড়তে যাচ্ছ তুমি তো মায়ের একমাত্র সন্তান ...।"

মুবি থলে থেকে আটটিন বিয়ার বের করে টেবিলে রেখে বলল, আমি এইসব বিয়ারের টিন দুর্যোগপূর্ণ সময়ের জন্য রেখেছিলাম। আজ সেদিন এসে গেছে। এখন সকলে গলাধঃকরণ করো।

শ্যাম ছুরি দিয়ে টিন ছিদ্র করে আর বিয়ারের পানি ছিটকে বেরিয়ে তার মুখে এসে পড়ে। তারপর তাড়াতাড়ি সে সোনালী পানি গ্লাসে ঢেলে দেয়। বিয়ারের ফেনা গ্লাসের কানায় কানায় ফুলে উঠেছিল যেমন সমুদ্রের তীরে বালুকা বেলায় ফেনা জমে ফুলে উঠে।

শ্যাম জিজ্ঞাস করে, "তুমি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেনা।"

প্রকাশ আবেগভরা কণ্ঠে বলল, " আমাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি বলছি কেন যুদ্ধে যাচ্ছি।"

পারভেজ বলল, "কারণ তোমরা বোকা। ইংরেজরা হিন্দুদের হিন্দুস্থান আর মুসলমানদের পাকিস্তান দেবেনা। এরা দু'জাতিকেই বোকা বানাচ্ছে। অজ্ঞ কোথাকার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলতে দাও তাকে।' মমতাজ বলল। "তার কথাও শুনতে দাও।" মমতাজের চোখে অশ্রু দেখা দিয়েছে।

প্রকাশ কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে মমতাজের দিকে তাকায়, "আমি মরতে যাচ্ছি। আর ফিরে আসবনা। আমি জাপানী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিজের রক্তদানের জন্য যাচ্ছি।"

সকলে হেসে উঠে। মুবি নীরবে তার কথা শুনছিল।

প্রকাশ বলল, "আজ দীর্ঘদিন পর বিয়ার খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। এর স্বাদ তো ...।"

হামিদ বলল, "সাবাস বেটা, মৃত্যুর আগে প্রাণভরে খেয়ে নাও।"

প্রকাশ বলেই চলেছে যেন সে নিজের সাথে নিজেই কথা বলছে। "যখন আমি মানসিক দু'টানায় ভুগছি ভাবছিলাম এখন কি করব। ফিরিঙ্গি ফ্যাসিবাদ ভাল না জাপানী। তারপর কি করব। নীরবে বসে বসে নিজের দেশের বুকে ইংরেজ ও জাপানীদের যুদ্ধ দেখব আর আমাদের নিজ গ্রাম ও শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার দৃশ্য নিরীক্ষণ করব। হাতের উপর হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকব। গোলামীর পর বেহায়াপনার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছে তারপর এক পর্যায়ে গিয়ে সব জাতি মৃতের সমতুল্য হয়ে পড়ে। গোলামীর পর স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। তবে যখন কোন জাতি গোলামীর সীমানা ছাড়িয়ে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জ অকর্মণ্যতার পরিচয় দেয় তখন সে কখনও স্বাধীনতা পেতে পারে না। তাই তো আমি জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ে নিজের রক্ত দিতে চাই। আমার এই পদক্ষেপ ফ্যাসিবাদের সকল প্রকার নির্যাতনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। এই ফ্যাসিবাদ দুনিয়ার যে অংশেই হোক না কেন। আর তার প্রভাব মিত্রপক্ষের কোন জাতির মাঝেও দেখা দিতে পারে। আমার লড়াইয়ে যোগদান ও আমার মৃত্যু নিশ্চয় এই ফ্যাসিবাদকে দুর্বল করবে যার এক ঝলক আমার বাড়িতেও পাওয়া যাবে।"

প্রকাশ একেবারে নিশ্চুপ। তার মুখমণ্ডল রক্তিম আকার ধারণ করে। সে বিয়ারের গ্লাস মুখে নিয়ে চুমুক দেয়।

পারভেজ বলল, "ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে কেন লড়ছনা? এতো কার্পেটও নয়, রেশম নয়, সিল্কও নয়।"

হামিদ বলল, "হয়তো প্রকাশ দু'টি রণাঙ্গনে লড়তে চায়না। কারণ হিটলারের পরিণতি তো দেখেছো।"

সকলে হাসছিল কিন্তু মুবি চুপ।

শ্যাম বলল, "কি পেত্নী তুমি কথা বলবে না।"

মুবি বলল, "রাজনীতির ব্যাপারে আমি নীরব থাকব। আমাকে দেয়া নির্দেশ আমি যতদূর সম্ভব পালন করব। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই, আমি ভারতে আসার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে আমাকে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতার পর দেখা গেল সে সব মিথ্যে। হয়তো আজ আমি এইসব সত্য স্বীকার করতাম না কিন্তু করছি কারণ আমি ফ্রন্টে যাচ্ছি।"

সকলে নীরবে তার কথা শুনছিল।

"আমাকে বলা হয়েছে, ভারতীয় মেয়েরা ভীতু। ওরা পর্দার আড়ালে থাকে আর সাদা চামড়ার লোকদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। এখন বুঝতে পারছি আসল ব্যাপার কি। ওরা পর্দায় অবশ্যই থাকে, ওদের লজ্জা শরম আছে সত্যিই, কিন্তু ভীতু নয়। ওরা তোমাদের পুরুষের চাইতে অধিক সাহসী। মেয়েরা প্রয়োজন হলে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে পিছপা হয় না।"

হামিদ ব্যঙ্গ সুরে বলল, এতো মুবি কথা বলছে না বরং সাপের বিষ যেন কথা বলছে।"

মুবি বলতে থাকে, "প্রত্যেক লোকই অন্যের বক্তব্য শুনতে চায় এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। এটাই মানুষের ধর্ম। তেমনি আমি তোমার ব্যাপারে অনেক বড় বড় কথা শুনেছি এবং তা বিশ্বাস করেছি। শৈমী নিশ্চয় তোমার সেই উপহার সম্পর্কিত কথা মনে পড়েছে। তুমি আমাকে ছোটলোক মনে করতে পার কিন্তু একথা ষোলআনা সত্য যে, আমি আজ পর্যন্ত তোমাকে একই মানদণ্ডে বিচার করেছি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"

'ভুল কিভাবে?' শ্যাম জানতে চায়। "পেত্নী চল্লিশ টাকা দামের বিয়ার খাওয়াচ্ছ। এরপরও কি বলতে চাও আমরা আর্থিক সুবিধা নিচ্ছি না। বিয়ার খেয়ে কি তোমার এতই নেশা ধরে যায়?"

মুবি মুচকি হেসে বলল, "আমি রাজনীতি বুঝি না শুধু মানুষের মন যাচাই করি। মনকে বুঝতে চেষ্টা করি। আমি তোমাদের মনকে যাচাই করে দেখেছি। যখন আমি আমেরিকা ফিরে যাব তখন ।"

'তাহলে কি হবে?' পারভেজের জিজ্ঞাসা।

মুবি বলল, "কিছুই না। শুন ঐ যে একটি বুলবুলি গান গাইছে।"

"এখানে বুলবুলি কোথায় গান গাচ্ছে? মুবি এটা তোমার ভুল ধারণা। এখানে পশ্চিমের ঘাটে কোন বুলবুলি গান গায়না।" পারভেজের উত্তর।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মুবি ধীর কণ্ঠে বলল, "কিন্তু ঐতো সেই একই আওয়াজ এই গানের সুর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।" তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

শ্যাম বলল, "নিউইয়র্ক থেকে ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হাঁ, নিউইয়র্ক থেকেও আসতে পারে যেখানে আমার বান্ধবী থাকে, আর ওহিওতে থাকে আমার মা।" মুবি স্মৃতির সায়রে ডুবে যায়। "এই ম্যাগনোলিয়ার এক গুচ্ছ ফুল আমার প্রিয়তমার চুলের ন্যায় সতেজ। আমার মায়ের সাদা চুলের ন্যায় পবিত্র।" মুবি ফুলদানি থেকে ম্যাগনোলিয়ার সফেদ গুচ্ছ স্পর্শ করে আর মোলায়েমভাবে হাত বুলিয়ে যেন আদর করছে।

প্রকাশ ফুপিয়ে উঠছিল বারবার।

মুবি বলল, "শ্যাম সত্যিই বলছি, আমি পার্ল হারবারের জন্য লড়ছিনা।' সে কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলল, "হয়তো আমি এই সফেদ এক গুচ্ছ ফুলের জন্য লড়ছি।' মুবি ম্যাগনোলিয়ার সাদা ফুলের গুচ্ছটি নিয়ে কপালে ঠেকায়।

সকলে নীরবে তার কথা শুনছিল। রাতও যেন নীরব নিস্তব্ধ চারিদিকে। সামনে বিয়ারের পেয়ালা পড়েছিল আর অনেক দূর থেকে যেন বুলবুলির গানের সুর ভেসে আসছিল।

কয়েক মাস কেটে গেছে। মুবির কোন চিঠি আসেনি। হয়তো সেন্সার। প্রকাশ নিরাপদে আছে। পরে জানা গেল, জাপানীদের সাথে লড়তে গিয়ে প্রকাশ মারা গেছে। এরপরও মুবির কোন চিঠি আসেনি।

পারভেজ বলল, "মার্কিনীদের বিশ্বাস করা যায় না। এখানে বেশ বন্ধুত্ব জমিয়েছিল, ওখানে গিয়ে হয়তো অন্য কারও সাথে ।" সিগারেটের ছাই ট্রেতে ফেলার পর যেন মুবিকে চিরতরে ভুলে গেল।

কয়েক সপ্তাহ মমতাজের চাহনি উদাস ছিল। সেও ক্রমশঃ ভুলে যায় সব কিছু। এরপর শ্যাম টাইফয়েড আক্রান্ত হয়। অসুস্থতাকালে একটি সেন্সারকৃত চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিটি ওহিও থেকে এসেছে। চিঠি খুলে শ্যাম ভাবল হয়তো শয়তানটা স্বদেশে ওহিওতে ফিরে গেছে। চিঠিতে লিখা ছিল;

প্রিয় পুত্র,

আমি তোমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করছি কারণ তুমি আমার ছেলে মুবির বন্ধু তাই তোমাকেই চিঠি লিখছি। সম্ভবতঃ তুমি তোমার মাকে সাহায্য করতে পার। মুবি মৃত্যুর আগে তার উইল লিখে গেছে। সে বিটলওয়াড়ীর একটি মেয়েকে বোন ডেকেছে। মেয়েটির নাম মোহনী। মুবি লিখেছে, তুমি মেয়েটিকে ভাল ভাবেই চেন। এখন মুবি আর বেঁচে নেই। তুমি নিশ্চয় আমার মেয়েটিকে এখানে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার। যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে জানাও। আমি নিজে ভারতে চলে আসব। যদি বেঁচে থাকি অবশ্যই আসব তোমাদের দেশে। আমি 'মোহনীর' সাথে দেখা করতে চাই এবং সম্ভব হলে তাকে সাথে করে আমেরিকা নিয়ে আসব। এটা কি সম্ভব নয়। হয়তো, তুমি একজন মার্কিন মহিলার আবেগকে ভুল বুঝতে পার আর কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিতে পার। কিন্তু আসলে তা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা একটা সুন্দর বাস্তব। কেন না আমার একমাত্র পুত্রবুকের রক্ত দিয়ে তা অর্জন করেছে।

তার শেষে চিঠিতে মুবি লিখেছে, যেদিন মোহনী তার পায়ের গোড়ালী থেকে চুষে সাপের বিষ বের করে নিচ্ছিল, মোহনী তার দেহের নয় বরং হৃদয়ের রক্ত চুষে বের করছিল। এই বিষ কালো আদমীকে শ্বেতাঙ্গ থেকে, গরীবকে ধনী থেকে এবং মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে রাখে। তখন তার মনে হয়েছে, ভালবাসা প্রতিটি সুন্দর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ও শেষ শর্ত। এছাড়া পৃথিবীতে কোন মানব সমাজ বেঁচে থাকতে পারে না। বিটলওয়াড়ীর নদীর ঘাটে যে প্রথমবার উপলব্ধি করতে পারে যে, ভালবাসার কোন রং নেই, তার কোন জাতিভেদ নেই, কোন ধর্ম নেই। এটা জীবনের শেষ ও স্থায়ী শক্তিস্বরূপ। সে যখন আসাম যাচ্ছিল তোমাকে সবকিছু জানাতে চেয়েছিল কিন্তু অত্যন্ত লাজুক ছেলে তাই ...।

বাবা, সে তোমাকে জানাতে চেয়েছিল, সে শুধুমাত্র ভালোবাসার জন্য লড়তে যাচ্ছে। সেই ভালোবাসা যা মনুষ্যত্ব থেকে সৃষ্টি। ফ্যাসিবাদের দ্বারা সৃষ্ট ঘৃণার বিরুদ্ধে। সে ভেবেছিল, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমাকে সবকিছু জানাবে, দেশবাসীকে অবহিত করবে। কিন্তু এখন তার লাশ আসামের কোন জঙ্গলে সেনা ছাউনীর মাটির নিচে পুতে ফেলা হয়েছে। তার সারা দেহে মৃত্যুর নিশানা ....।

প্রত্যেক মা ছেলের মৃত্যুতে ব্যথা পাবেই। সে ছিল আমার একমাত্র ছেলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তার শেষ চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে, সে হারিয়ে যায়নি। এখনও সে আমার কাছেই বসে আছে আর হেসে হেসে বলছে, দেখ মা, তোমার জন্য একটি মেয়ে এনেছি।

তার চিঠি পড়ে আমার আজ আবার সেই সীমাহীন বেদনা ও আনন্দের অনুভূতি চাড়া দিয়ে উঠেছে যা আমি তার জন্মলগ্নে অনুভব করেছিলাম। এখন আর কিছু লিখতে পারছি না।

তোমারই
মা ইলিথার

পারভেজও শ্যামের পাশে বসে ঝুকে পড়ে এই চিঠি পড়ছিল। চিঠি পড়তে গিয়ে তার আঙ্গুল যেন শ্যামের হাতের মুঠোয় জমে গেছে আর মুখ দিয়ে আর্তনাদ বোরোয়, "মুবি"।

শ্যাম মুখ ঘুরিয়ে নেয় আর চোখের পানি মুছে নিয়ে কম্পিত হাতে ম্যাগ্নোলিয়ার সাদা ফুলের গুচ্ছটি কপালে ঠেকায়।

রাত নিস্তব্ধ নিঝুম। ফুলও নীরব। শুধু অনেক দূর থেকে যেন কোন বুলবুলির গান ভেসে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ভগতরাম

কিছুক্ষণ আগে ছেলেটা আমার বা-হাতের আঙ্গুল কামড়ে দেয়। আমি ব্যথা সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠি। আর রাগে তার গালে কয়েকটা চড় কষে মারি। মার খেয়ে ছেলেটা কান্না জুড়ে দেয়।.দুষ্টু শিশুরা কত নিষ্পাপ অথচ এদের হাত বেশ মজবুত আর দাঁতের তো জুড়ি নেই যেন ধারালো করাত। আমার ছোট্ট শিশুটির দুষ্টুমি দেখে আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য ঘটনাটি অত্যন্ত মামুলী এখন অনেকটা ভুলে গেছি।

ঘটনাটি হলো, আমার গ্রামের ভগতরামের কথা বলছি। ছোটবেলায় আমি তার বুড়ো আঙ্গুল কামড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে চড় মারার পরিবর্তে নাসপাতি ও আলুর চপ খাইয়েছিল। ঘটনাটি যদিও আমি ভুলতে বসেছি কিন্তু আমার স্মৃতির সায়রে সেই ঘটনাটি আবার দোলা দিয়ে উঠল আমার ছেলে আমার হাতে কামড় দেয়ার পর। স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর একবার নাড়া দিয়ে উঠলে তাকে তাড়ানো বড় মুস্কিল।

তখন আমরা রংপুরের গ্রামে থাকতাম। রংপুর গাঁয়ে আজুরী তহশিলের সদর। তহশিলের হেড কোয়ার্টার হিসাবে গ্রামটা এখন ছোটখাট শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। অবশ্য যখনকার কথা বলছি তখনকার দিনে রংপুর গ্রামের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। আড়াইশ থেকে শ'তিনেক বাড়িঘর ছিল। অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়। দশ-বারোটা পরিবার ছিল তাঁতী ও কাঠুরিয়া। পাঁচ-ছয়টি পরিবার ছিল চামার ও ধোপা। সারাগাঁয়ে আট-দশটি মুসলিম পরিবার ছিল। তাদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাই তাদের কথা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল।

গ্রামের সর্দার লালা কাশিরাম। আসলে ব্রাহ্মণ সমাজের বিধি মোতাবেক একজন ব্রাহ্মণকে গ্রামের সর্দার মনোনীত করা উচিত ছিল, কারণ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ব্রাহ্মণ। কিন্তু গ্রামবাসীরা ক্ষত্রীয় বংশধর লালা কাশি রামকে গ্রামের সর্দার মনোনীত করেছিল। কাশিরাম গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত লোক। সে শহরে গিয়ে লেখাপড়া করেছে। পোস্টম্যান যে চিঠি পড়তে পারে না সে তাও পড়তে পারে। সালিশ, নালিশ, সমন, সাক্ষী, জমি-জমার বিবিধ মাপ ছাড়াও কাশিরাম শহরের মামলা-মোকদ্দমার আইন-কানুন ভালভাবেই ওয়াকেফহাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। তাই গ্রামবাসীর যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যে জাতের লোকই হোক না কেন লালা কাশিরামের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যেতো। লালা কাশিরামও কখনও গ্রামবাসী কাউকে সাহায্য করতে আপত্তি জানায়নি। তাই সে গ্রামের সর্দার ও হর্তাকর্তা। নিজ গ্রাম রংপুর ছাড়া সবুজ ধানক্ষেত যতদূর দেখা যায় দূরদূরান্তর গ্রামে পর্যন্ত তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

লালা বংশীরাম ছিল কাশিরামের মেজো ভাই। সেও ছিল অত্যন্ত ভদ্র। সেও অবশ্য ভাইয়ের কাজে নানাভাবে সাহায্য করতো। কিন্তু গ্রামবাসীর তার প্রতি ধারণা ভাল ছিল না। কারণ সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নানকের পথ অনুসরণ করছিল। বংশীরাম তার বাড়িতে একটি গুরুদ্ধারও প্রতিষ্ঠা করেছিল। শহর থেকে একজন নানকপন্থী লোককে শিখ মতবাদ প্রচারের জন্য এই গুরুদ্ধারে নিযুক্ত করে। লালা বংশীরাম শিখ ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে গ্রামে মুসলমানদেরও শিখদের মধ্যে হারাম-হালাল নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এতে মুরগী ও মোরগ কুলের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মনুষ্যকুলের জন্য কি-বা আসে যায়।

লালা বংশীরামের ছোট ভাই ভগতরাম। এই ভগতরামের হাত আমি শিশু অবস্থায় কামড়ে দিয়েছিলাম। সে কাহিনী পরে বলবো। এবার তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল শুনুন।

ভগতরাম ছিল ভবঘুরে আর চরিত্রহীন টাইপের লোক। যদিও তার নাম ছিল ভগতরাম-কিন্তু সে রামের ভক্ত ছিল না বরং শয়তানের ভক্ত। রংপুর গ্রামে ভণ্ডামী বদমায়েসী আর যত কুকর্মের নায়ক ছিল ভগতরাম। অন্যথায় ভগতরাম না থাকলে রংপুর গাঁকে স্বর্গস্থানের সাথে তুলনা করা যেতো।

ঝগড়াবিবাদ হলে লালা কাশিরাম তা মিটমাট করে দিতেন আর কেউ ধার শোধ করতে না পারলে সে নিজ পকেট থেকে পরিশোধ করে তাকে কাজে লাগিয়ে দিতেন। মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় কম। তাই তারা কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতো না তদুপরি তারা মসজিদে আজান পর্যন্ত দিতে পারতো না। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদেরকে নিষেধ করেছিল। তারা ছিল অচ্ছুৎ। জীবন তাদের কাছে যেমন চলছে তাই চলুক ধরনের ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, চামার, কুমার সকলে ভগতরামকে গালাগালি দিতো। কারণ তার কোন সংশোধন হয়নি।

ভগতরাম ছিল অত্যন্ত সৌখিন ও আড্ডাবাজ। মুখে তার বড় বড় বুলি। সর্বদা হাসিমুখ। হাসলে তার দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা যেতো। গ্রামে হিন্দুদের অধিকাংশ মাথা মুড়ানো আর টিকি। আর ভগতরামের ছিল লম্বা লম্বা চুল যেন বেলুচ সিপাহী। আর চুলের আগায় ছোট ছোট বেনী পাকানো। দৈনিক দু'তিনবার মাথায় সরষে তেল মাখতো। গলায় থাকতো ফুলের মালা এবং সারাদিন পুকুর আর খালের আশেপাশে ঘুরঘুর করতো। তার এই আপত্তিকর ঘুরাফেরার জন্য কয়েকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারও খেয়েছে কিন্তু তার গায়ের চামড়া ছিল অত্যন্ত মোটা। তার কাছে বিবেক বলে কিছু ছিল না। পশুর চেয়ে সে ছিল নিকৃষ্টতর। আসলে সে ছিল পশুতুল্য। তাই গ্রামের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলমান, স্বর্ণকার, চামার, সকলে তাকে ঘৃণা করতো।

তবুও সে ছিল গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি লালা কাশিরামের ছোট ভাই। সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাই তাকে পছন্দ না করলেও কাশিরামের ভাই হিসাবে গ্রামবাসীরা তার সব অপকর্ম ও কুকীর্তি বরদাস্ত করে আসছে। এখনও করছে। অবশ্য আমরা যখন রংপুর এলাম কাশিরাম ভাইয়ের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। তার একটি আটারকল ছিল সেখানেই তাকে নিযুক্ত করে। রাতে সে সেখানেই শুতো। তাছাড়া আটারকল দেখাশুনার জন্য একজন লোকেরও দরকার ছিল। গম কলে ঢেলে দেওয়া, বস্তায় ভর্তি করা ইত্যাদি। লালা কাশিরামের কলে গ্রামের সকলে গম পিষতো। অবশ্য গাঁয়ে আরও একটি গম ভাংগানোর কল ছিল, সেখানে তেমন ভিড় জমতো না। অবশ্য বড় আটারকলে মুসলমানও অচ্ছ্যুতরা আটা পিষতে যাওয়ার সাহস করতো না। ভগতরাম কিন্তু সব রীতিনীতি ভংগ করে, গম নিয়ে যেই আসুক তাদের গম পিষে দিতো। এতো গম, তাকে পাথরের চাকায় পিষলে কিই-বা আসে যায়। বরং ভগতরাম ভাবলো, এতে তার আয় বাড়বে তদুপরি অন্যান্য আটারকলের অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। এই ধরনের আজেবাজে ভাবনা ছিল ভগতরামের চিন্তারাজ্যে। তাই সে চামার কামার সকল গোত্রের লোকজনকে তাঁর আটারকলে গম পিষানোর আমন্ত্রণ জানায়।

প্রথম প্রথম লোকেরা তার এই আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি কারণ তাদের ভাষ্য হলো, "আমরা প্রজা, আমাদের দ্বারা এমন বেয়াদবি করা সাজে না। তুমি হলে রাজা। আমাদের জন্য পৃথক আটারকল আছে। এমতাবস্থায়, আমাদের গম তোমার কলে পিষানো ঠিক নয়। না, বাবা, এমন নীতিগর্হিত কাজ আমরা করতে পারি না।" কিন্তু ভগতরাম চালাক মানুষ। সে তাদের ফুসলিয়ে বুঝিয়ে তার কলে আটা ভাংগতে আসার ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করতে থাকে। ধীরে ধীরে সকলে তার কলে গম ভাংগাতে আসে।

তার এই কান্ডকীর্তি দেখে গোত্রের লোকজনের মাঝে বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়। রোজ ভগতরামের লোকজনের ঝগড়া বিবাদ লেগেই ছিল। সে ছিল স্বাস্থ্যবান তাই মানুষের গালি সে গায়ে মাখতো না হেসে সবকিছু হজম করে নিতো। আবার রেগে গিয়ে দু'একজনকে পিটুনীও দিয়েছে। প্রতিদানে সেও মার খেয়েছে। ঘটনা অবশেষে লালা কাশিরামের কানে গিয়ে পৌঁছে। সে ছোটভাই ভগতরামকে ডেকে এনে অনেক বুঝালো। কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। আগে যখন ভগতরাম বাড়িতে থাকতো, বড় ভাইয়ের ভয়ে পাছে কিছু বলেন, সে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সে আটারকলে থাকে, তার কোন ভয় নেই। কে তাকে উপদেশ দেবে, কেবা দেখাশুনা করবে। এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। এবার ভগতরাম গাঁজা খেতে শুরু করে আর নদীর ধারে আগত একজন মুসলমান ফকিরের আস্তানায় আনাগোনা শুরু করে। এই ফকির কিছুদিন হলো নদীর ধারে এসে আস্তানা পেতেছে, সঙ্গে তার স্ত্রী ও এক যুবতী মেয়ে। ধীরে ধীরে ভগতরাম আটারকলের কাজে গাফিলতি করতে শুরু করে। সারাদিন সে ফকিরের আস্তানায় কাটাতো আর গাঁজা চরস খেয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকতো। বড় ভাই অনেক বুঝালো কিন্তু কোন কথাই তার কানে গেলো না। আসলে তার নেশা ছিল অন্যত্র। কয়েকদিন পর জানা গেলো, ভগতরাম শহরে গিয়ে সেই মুসলমান ফকিরের মেয়েকে বিয়ে করেছে আর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। সারাগাঁয়ে হৈ-চৈ পড়ে যায়। ভগতরাম মুসলমান হওয়ার পর মাথায় টুপি পরতে শুরু করেছে। মুসলমান ফকিরটা ভয়ে সেই গাঁয়ে কোনদিন যায়নি কারণ তাহলে কাশিরাম আর বংশীরাম অবশ্যই তার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু ছোট ভাইকে তারা কিইবা বলবে, ভগতরাম বউ নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। আর ভাইয়ের আটার কলে এসে বসবাস শুরু করে। স্বামী স্ত্রী দু'জনই সেখানেই থাকতো। ভগতরাম অত্যন্ত খুশী। সে মকমলের পাঞ্জাবী আর কালো জহুরী কোট পরে বুক ফুলিয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় আর বউ-ঝিদের কাছে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার শুরু করে।

ভগতরামের দুষ্কর্মের জন্য গ্রামবাসীরা তাকে ঘৃণা করতো, তার নাম-ডাক ছিল সারাগাঁয়ে। ছোটকালে মা-বাবা আমাকে গালি দিলে ভগতরামের দুশ্চরিত্রের সাথে তুলনা করতো আর আমি কেঁদে ফেলতাম। ভগতরামের নাম শুনলে আমার গা-জ্বালা করতো। একে তো সে আমার ধর্ম ত্যাগ করেছিল আবার মুসলমানদের কাছে গিয়ে মসজিদে আযান দেবার জন্য আবদার করতো। এটা অবশ্য মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর ছিল। কিন্তু কেউ তার অনুরোধ রক্ষা করেনি। ভয়ে ভয়ে ওরা বলেছে, আজ পর্যন্ত গাঁয়ে এমন ঘটনা ঘটেনি। জবাব শুনে ভগতরাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল আর নিজে ওজু সেরে সোজা মসজিদের মিনারে গিয়ে উচ্চস্বরে আয়ান দেয়। তার আযানের ধ্বনি পাহাড়, নদী, ধানক্ষেত পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আর এই আযানের ধ্বনি গাঁয়ের প্রত্যেকটা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়ের বুকে ভীতির সঞ্চার করে। ঘোর কলিযুগ। হায় ভগবান, এবার নিশ্চয় কোন নিষ্কলংক অবতার সৃষ্টি হবে। লালা কাশিরাম ব্রাহ্মণদের সাথে শলাপরামর্শে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করে আর ভাইয়ের অপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলে। আর ছোট ভাই ভগতরামকে ত্যাজ্য বলে ঘোষণা করে। তাকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বাদ দিয়ে দেয়। পুরাতন আটারকলের বদলে নতুন একটি কল প্রতিষ্ঠা করে। পুরনো আটার কলের অবস্থা কাহিল যেখানে ভগতরাম ও তার স্ত্রী থাকতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে গ্রাহক মোটেই আসতো না। মুসলমান পরিবারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এরাও তাকে সাহায্যদান ক্রমশঃ বন্ধ করে দেয়। আসলে গ্রামের সমাজের লোকজন কেউ তাকে পছন্দ করতো না। লোকেরা নানাজনে নানা কথা বলে। তবুও ভগতরাম তার স্ত্রীর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। তার স্ত্রী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। গ্রামে তাকে কেউ কাজেও ডাকতো না। সে রাতের কথা আমার এখনও মনে আছে, যে রাতে তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা হয়। ভগতরাম এসে আমার মায়ের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে, মার পা ছুঁয়ে বলেছিল, "মা আপনি চলুন, আমার স্ত্রী প্রাণে বেঁচে যাবে।" আমার মা অনেক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রীয় ও ব্রাহ্মণ পরিবারে গিয়ে ধাত্রীর কাজ করেছে। সে ভগতরামের মতো লোকের স্ত্রীর ধাত্রী হতে যাবে কেন? মাঝরাতে এসে ভগতরাম অনেক কান্নাকাটি করেছে কিন্তু আমরা দরজা খুলিনি বরং মজা করে ঘুমিয়েছিলাম পরদিন জেনেছি, ভগতরামের স্ত্রী রাতে আতুড়ঘরেই মারা গেছে।

ভগতরাম অনেক কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু সে কান্না ছিল মানুষের নয় একজন জানোয়ারের। আসলে, সে অল্প দিনের মধ্যে স্ত্রীর কথা ভুলে গিয়েছিল। এবার সে ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে নিজেকে ভগতরাম বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। মুসলমান ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার নাম ছিল খোদাবখস। আবার সে গাঁয়ের অলি-গলিতে চক্কর দিতে শুরু করে। কিন্তু সাবাস হিন্দু সমাজ, কেউ তাকে পাত্তা দেয়নি। তার আপন ভাই পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেনি। ভগতরামের অবস্থা বেগতিক ও কাহিল, সে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কয়েকদিন পর ভগতরাম গায়েব। তিন চার মাস যাবত সে নিখোঁজ, তাকে কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ সে আবার গ্রামে এসে হাজির। সে এখন সাপুড়ে। হাতে তার বীণ আর ঝুড়িতে কয়েকটি বিষাক্ত সাপ। সে সাপ খেলা দেখায় আর গাছগাছড়া ও তাবিজ বিক্রি করে। তার এই তাবিজ সর্বরোগের মহৌষধ। সাপ খেলা দেখিয়ে আর তাবিজ বিক্রি করে ভগতরামের বেশ ভাল আয় হতে লাগল। আর সাপের খেলা দেখতে প্রচুর লোক সমাগম হতো। ভগতরামের সাপ খেলা দেখতে আমার ন্যায় অনেক শিশুকিশোর ভিড় জমাতো।

আমার আম্মা ছিলেন গাঁয়ের নামকরা ধাত্রী। ভগতরামের এই বহুরূপী অবস্থা তার কাছে ভাল লাগেনি। মায়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে, তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতেন। কিন্তু জবাবে ভগতরাম কিছুই বলতো না বরং মুচকি মুচকি হাসতো, মাথা চুলকাতো আর চলে যেতো। এক নম্বরের বদমায়েস ছিল সে।

ধীরে ধীরে ভগতরামের গাছ-গাছড়ার ঔষধের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি হাঁপানি ও কঠিন রোগাক্রান্ত রোগীরাও ভগতরামের ঔষধ নিতে আসতো। এবার সে বাজারে একটি দোকান ভাড়া করে সেখানে তার ঔষধির দোকান খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে। দোকানটি ছিল মুলু মুচির। অর্ধেক দোকান ভগতরামকে ভাড়া দিয়েছিল আর বাকী অর্ধেক দোকানে মুলু মুচি জুতা সেলাই করতো। সেখানে তার স্ত্রী, মেয়েও কাজ করতো আর মুলু মুচিকে সাহায্য করতো। যখনই দেখবে, তিনজনেই জুতা সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। পাশের কামরায় ভগতরাম গাছগাছড়ায় ঔষধ আর তাবিজ বিক্রি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। সে পথচারীদের সাপের খেলা দেখাতো। সে সাপের মুখে তার জিহ্বা লাগিয়ে দিতো আর বলতো সিনকিয়া বিষ তার দেহে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কারণ তার কাছে এমন সব গাছগাছড়া ছিল যার বদৌলতে যে কোন মারাত্মক বিষকে পানি করতে সক্ষম। আসলে এসব মিথ্যা কথা বলে গ্রামের সরল মানুষকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছিল। আমার মা এসব কথা শুনলে দারুণ রেগে যেতেন। কিন্তু আমাদের কিছুই করণীয় ছিল না। তাছাড়া ভগতরামের চিকিৎসার উপর গ্রামবাসীদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা জন্মেছিল। এবার ভগতরাম নদীর ওপারে একটি মাটির বাড়ি তৈরি করেছিল। অবসর সময়ে ভগতরাম সেখানে বাগানে কাজ করতো।

আমি ভগতরামকে ঘৃণা করতাম। তার বাড়িতে কোনদিন যাইনি। কিন্তু তার দোকানে সুন্দর একটি ময়না ঝুলানো থাকতো। ময়নাটি ছিল খুব সুন্দর, মিষ্টি সুরে কথা বলতো। আমি শুধু সেই ময়নাটিকে দেখার জন্য তার বাড়িতে চলে যেতাম। সে অবশ্য আমাকে কোনদিন উত্যক্ত করেনি। তবে আমি মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলাম, ভগতরাম আমাকে ভৎর্সনা করলে আমি পাথর ছুড়ে তার মাথা ফেটে দিতাম।

ভগতরামের অবস্থার আরও উন্নতি ঘটে। কিন্তু তার চালচলন গ্রামবাসীদের পছন্দ হয়নি। প্রকৃত ঘটনা হল, রামধাই মুলু মুচির বোন। তার সাথে লালা বংশীরামের অবৈধ প্রেম ছিল। পরিণতিতে রামধাই অন্তঃসত্ত্বা। লালা বংশীরাম ভাই ভগতরামকে অনুরোধ করেছিল এমন ঔষধ দিতে যেন রামধাই এর ভ্রুণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগতরাম তার এই অনুরোধ রক্ষা করেনি বরং সরাসরি অস্বীকার করে আর সারা গাঁয়ে এই ঘটনা প্রচার করে। এরপর বংশীরাম গাঁয়ে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারেনি। বরং সে কয়েক মাসের জন্য শহরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। এদিকে বেচারী রামধাই-এর অবস্থা ছিল আরও করুণ। এই ঘটনা বড় ভাই কাশিরামের কানে গেলে সে তাদের পারিবারিক ধাত্রী আমার মায়ের সাহায্য প্রার্থনা করে। আমার মা তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বসে; পরিণামে বেচারী রামধাইকে সেই অবৈধ সন্তান পেটে নিয়ে ন'মাস পর্যন্ত গ্রামে নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। অবশেষে এই অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ট হয়। তার আত্মীয়স্বজন রামধাইকে ত্যাজ্য করে দেয়। এখন কোন সাহায্যকারী তার রইল না। তার আবার স্তনে দুধ ছিল না। ছেলেকে দুধ খাওয়ানো আর নিজের প্রাণ বাঁচানের জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে রামধাই ভগতরামের কাছে গিয়ে হাজির হয়। অসভ্য ভগতরাম এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এতদিন। সে রামধাইকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিল। আর বিয়ে ছাড়াই দু'জনে সংসার করতে শুরু করে। গ্রামে কখনও এমনটি ঘটেনি। এই ধরনের বেহায়াপনার কাজ প্রথম ঘটলো। এমন বিশ্রী কাজ কি কেউ চোখ মেলে চেয়ে থাকতে পারে। ভগতরামের দোকান তুলে দেয়া হল। তারপর তাকে জুতাপেটা করে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হল আর সতর্ক করে দেয়া হল, ভবিষ্যতে গ্রামমুখো হলে তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।

ভগতরাম নিজের ঘরেই থাকে আর আশেপাশে সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে রামধাই ও অবৈধ বাচ্চার ভরণপোষণ করে। অনেকের ধারণা, সে জীবন সম্পর্কে উদাসীন আর খামখেয়ালী। আসলে তা সত্য নয়। যেমন পাকা কলসীতে পানি রাখলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এত ঘটনার পরও ভগতরামের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি, তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। তার মাঝে কোন অনুভূতি নেই যে সে পাপ করেছে। সে বুঝতেই পারেনি যে, তার কর্মকান্ডের ফলে ভগতরামের মা বাবা, নিজ পরিবারের মুখে কালিমা লেপন করে দিয়েছিল। সে সর্বদা হাসি খুশী থাকতো যেন কিছুই হয়নি।

একদিন আমি দুপুরে তাকে তার ঘরে দেখতে পাই। একটি খাটিয়ায় শুয়েছিল। আর রামধাইকে সোহাগ করছিল। এর আগে কখনও স্ত্রী পুরুষকে চুমো খেতে বা সোহাগ করতে দেখিনি। এই দৃশ্য দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই আর আমার মায়ের সতর্কবাণী কানে বাজতে থাকে, "বাবা," কখনও ভুল করে ভগতরামের দিকে যেওনা। সে বদ ও অসভ্য লোক। রাগে অভিমানে আমার চোখে জল দেখা দেয় আর আমি ফিরে যেতে উদ্যত হই। ভগতরামের পোষা ময়নাটি আমাকে দেখে বলছিল "ছোটমণি, এসো এসো তোমাকে মিষ্টি দেবো। এসো এসো।" ময়নার আওয়াজ শুনে ভগতরাম উঠে আমাকে ধরার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে আসছিল। খুনী ডাকাতের হাতে পড়ার আগেই আমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যাই।

পিছু পিছু ভগতরামও ছুটে আসছিল আর হাঁক দিচ্ছিল শুন বাবা, শুনে যাও। আমি এমন বোকা নই যে থামবো, আমি প্রাণপণ ছুটতে থাকি। হঠাৎ সে আমার ঘাড়ে এসে পাকড়াও করে। আমি তার হাতে এত জোরে কামড় বসিয়ে দেই যে, সে চীৎকার করে উঠছিল কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেয়নি। আমাকে চড়ও মারেনি। সে আমাকে তার বাড়ির আঙ্গিনায় নিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে বলল, দুষ্টো কোথাকার, আমি কি আগের মতো দৌড়াতে পারি। আর রামধাইকে দেখিয়ে বলল। এটা তোমার মাসি। তাকে প্রণাম কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম "আমার মাসি হতে যাবে কেন, আমি তাকে নমস্কার করবো না।"

ভগতরাম হাসতে হাসতে ছেলেকে দেখিয়ে বলল, এটা তোমার ছোট ভাই। তার সাথে খেলা করো?

আমি জবাব দিলাম, আমি তার সাথে খেলা করব না। মা বলেছে রামধাই-এর ছেলে জারজ।

তড়িৎগতিতে রামধাই তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। ভগতরাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, নাসপাতি খাবে নাকি কুল খাবে।

আমি মাথা দুলিয়ে অসম্মতি জানাই। সে জোর করে আমার পকেটে নাসপাতি ও কুল ভরে দেয় আবার হেসে বলল, ময়না পাখিটি তোমার পছন্দ হলে নিয়ে যাও। একথা বলার পর সে পিঞ্জরটি আমার হাতে দিয়ে দেয়।

আমি বললাম, তোমার ময়না আমার দরকার নেই। আমার মা বলেছেন, ভগতরাম মানুষ নয় জানোয়ার। সে চামারের চেয়েও খারাপ। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার ময়না আমার দরকার নেই।

সে মুচকি হেসে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, এবার পালাও।

আমি এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির হই আর মাকে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিই। মা তো আমার উপর রেগে টং আর আমার পকেট থেকে নাসপাতি আর কুল বের করে বাইরে ছুড়ে মারে। তিনি ভগতরামকে উদ্দেশ্য করে অনেক গালাগালি ও তিরস্কার করে।

এরপর আমি ভগতরামের বাড়িতে কোনদিন যাইনি।

কয়েকমাস পর লালা বংশীরাম শহর থেকে ফিরে আসে। এবার সে মুলু মুচিকে অনেক বুঝিয়ে ভগতরামের বিরুদ্ধে ফুসলানো ও মেয়ে অপহরণের মামলা দায়ের করতে সফলকাম হয়।

ভগতরামের ছয় মাসের জেল। কারাভোগের পর সে মুক্তি পায়। কিন্তু জেলে থাকার ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তার চেহারার সেই জৌলুস আর নেই। এখন আর সে বুক উঁচিয়ে হাঁটতে পারে না বরং মাথা নিচু করেই পথ চলতে থাকে। তাকে বেশ উদাসীন মনে হচ্ছিল। তাও কিছুদিনের জন্য। আবার সে গ্রামে গ্রামে গিয়ে গাছ গাছড়ার তাবিজ বিক্রি শুরু করে। ভদ্রলোকেরা তার সাথে কথা বলতো না আর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতো না।

হিন্দু মুসলমান কামার চামার সকল গোত্রের লোকেরা তাকে ভবঘুরে ও চরিত্রহীন বলে জানতো। আর আমাদের গ্রামে সে তো সবার মুখে মুখে। আমার মা বলতেন, "দেখো, খারাপ কাজ করলে তার পরিণতি ভগতরামের মতোই হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন আর অর্থহীন আর মৃত্যুও ঘটেছিল তেমনিভাবে। আমি তাকে মরতে দেখিনি তবে যারা তার মৃত্যু দেখেছে তারা এখনও তার পাগলামোর ঘটনা বলে হাসতে থাকে। নদীর তীরে ভগতরাম তার স্ত্রী রামধাইসহ দাঁড়িয়েছিল। তুমুল ঝড় ও বর্ষার পানিতে নদীর বুক ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। নদীতে তিন চারটি ছাগলেরছানা ভেসে আসছিল আর ঢেউ-এর টালমাটালে একবার ডুবে আবার ভাসছিল। ছাগলছানাগুলি ভে ভে করছিল, যেন আর্তনাদ করছে। ভগতরাম কয়েক সেকেন্ড এই ছাগল ছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর হঠাৎ এই উন্মত্ত নদীর ঢেউ-এ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে ছাগলছানাগুলোকে বাঁচানোর জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। পরদিন ঝড় থেমে গেলে ভগতরামের লাশ নদীর পশ্চিম তীরে পাওয়া যায়। তার অর্ধেক দেহ তখনও নদীর পানিতে ডুবেছিল। কি বোকার মত মৃত্যুবরণ করলো। ভরা যৌবন নিয়ে সে যেভাবে পশুর মতো মৃত্যুবরণ করলো তার কোন মানে হয় না।

তার ভাইয়েরা তাকে ক্ষমা করে দেয়। অবশ্য তাকে আগেই আত্মীয়-স্বজনেরা 'ত্যাজ্য' করেছিল। সে তখন না হিন্দু না মুসলমান ছিল। তবুও তার ভাইয়েরা তার লাশ তুলে আনে আর হিন্দু ধর্মমতে শ্মশান ঘাটে দাহ করে। ভগতরামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

এই কাহিনী ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যকার ঘটনা। আমার ছোট্ট ছেলেটি আমার হাতের আঙ্গুল কামড়ে দিলে আমি তাকে চড় মেরেছি কষে। নিষ্পাপ শিশুটি আমার চড় খেয়ে সোফায় মুখ গুঁজে কাঁদছিল। আমি এখন ভাবছি, ভগতরামের কোন ধর্ম-গোত্র ছিল না। সে ছিল গোঁয়ার আর গাছগাছড়া বিক্রি করতো। একজন মুসলমান সন্ন্যাসিনীকে বিয়ে করেছিল। আবার একজন অচ্ছ্যুত বিধবাকে নিয়ে বিয়ে ছাড়াই সংসার পেতেছিল। আবার জেলও খেটেছিল এই অপকর্মের জন্য। গ্রামে সে বদমায়েস ও বদলোক হিসেবে খ্যাত ছিল। তাকে আমাদের গাঁয়ের লোক ছাড়া আশেপাশে লোকজনও ঘৃণা করতো। এখনও করে থাকে।

আমি ভগতরামকে হয়তো চিনতে পারিনি। হয়তো তাকে চিনতে ভুল করেছিলাম। তুমি এসব বড় লোকদের চেয়ে অনেক ভাল ও শ্রেষ্ঠ যারা সমাজের উঁচুতলার লোক। এসব উঁচুতলার লোকজন দালান প্রাদাস তৈরি করে মানুষকে ফুটপাতে শুতে বাধ্য করে। মহিলাদের ইজ্জত নষ্ট করে ভাল মানুষ সেজে বসে। এসব মুখচেনা ভদ্রলোকরাই, আমোদ ফুর্তির জন্য বাগানবাড়ী তৈরি করে নামমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মেয়েদের উপভোগ করে আর তাদের সন্তান-সন্ততিদের এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়।

সেসব এতিমখানা এসব বিত্তবান লোকেরাই তৈরি করে আর সমাজের উঁচু স্থানে বসে এতিম শিশুদের গালাগালি করে। ভগতরাম এমনি লোকদের চেয়ে অনেক ভালো যারা ট্রাকটার, উড়োজাহাজ, মেশিনগান, থিয়েটার, সিনেমা আকাশচুম্বী দালান, সিনেমা হল, ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়, সিংহাসন, উপনিষদ, দর্শন, সাহিত্য ও ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে আর মানুষ সৃষ্টির অতল গভীর অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে দারুণভাবে বিরক্ত করে।

ভগতরাম, তুমি এসব লোকদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে, অনেক শ্রেয়ঃ। তুমি ভবঘুরে ছিলে সত্য কিন্তু তুমি ছিলে সত্যিকারের একজন কবি। ভগতরাম তুমি এমন একজন কবি যারা প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি যুগে, সর্বত্র পয়দা হয়। কিন্তু ভদ্রলোকেরা তোমাকে বুঝতে চায়না। এসো বন্ধু আমার সাথে হাত মিলাও।

কিন্তু ভগতরাম তো আমার সাথে কথা বলতে পারেনা কারণ সে মৃত। ১৯৩৪ সালে ঝড়বৃষ্টির মাঝে নদীতে ডুবন্ত ছাগলের বাচ্চাদের রক্ষা করতে গিয়ে সে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই নদীর তীরে তার লাশ পোড়ানো হয়। তার জন্য কেউ এক ফোঁটা অশ্রুও ফেলেনি। তার লাশ পোড়ানো হচ্ছিল আর চিতা থেকে আগুনের ফুলকি আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠেছিল। রক্তিম আগুনের ঝলক। চিতায় তার দেহ পুড়ছে, চিতা জ্বলছে অথচ কারও চোখে অশ্রু নেই। আর প্রকৃতিকেও উদাস মনে হয়নি। আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার, চারিদিকে ঝলমলে রোদ উঠেছিল।

আকাশে সাদা সাদা মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর পাশ দিয়ে নদী কুলকুল রবে শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# বোবার ভালবাসা

করাচীতে তার যে পেশা ছিল, বোম্বাইয়ের বান্দ্রে এসেও একই ধান্ধায় ব্যস্ত জাতপাতের তার কোন পার্থক্য ছিল না। করাচীতে সিদু মিষ্টিওয়ালার বাড়িতে সিঁড়ির পেছনে অন্ধকারে রাতে ঘুমাতো। এখানেও তার সিঁড়ির পেছনে জায়গা মিলেছে। করাচীতে তার কাছে একটি ময়লাযুক্ত বিছানা, জংধরা কালো রংয়ের ছোট্ট ট্রাঙ্ক এবং একটি পিতলের বদনা ছিল। এখানেও তার আসবাবপত্রের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি, যা ছিল তাই। করাচী ও বোম্বাইয়ের প্রতি তার কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল না। আত্মিক সম্পর্ক কাকে বলে, কালচার কাকে বলে, দেশপ্রেম কি, কি দরে বিক্রি হয়। এসব নয়া ধান্ধা সম্পর্কে সে পরিচিত ছিল না। যখন থেকে তার জন্ম হয়েছে, সিদু মিষ্টিওয়ালার বাড়িতেই আছে। বাড়িতে বাসন-পেয়ালা পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেয়া, পানি সংগ্রহ করা, বিছানাপত্র পরিষ্কার করা আর সবার গঞ্জনা সহ্য করা। অবশ্য এর জন্য তার কোন দুঃখ ছিল না। কারণ সে জানে, কাজ করা আর গালি সহ্যের পর দু'বেলা আহার পাওয়া যায়। তাছাড়া সিদু মিষ্টিওয়ালার বাড়িতে সে ক্রমশ বড় হচ্ছে, তার থাকা খাওয়ার একান্ত প্রয়োজন। তাই সিদুর তিরস্কার ও গালাগালি তার রুটির টুকরোর সাথে পেটে হজম হয়ে যেতো।

তার বাবা-মা কে ছিল কেউ জানে না। নিজে চন্দ্র অবশ্য কখনও এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আর মিষ্টিওয়ালা, তাকে তিরস্কার করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় বলতো, চন্দ্রকে সে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছে।

এ ব্যাপারে চন্দ্র কখনও হতবাক হয়নি আর সিদুকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তার মনে কোন আবেগের জন্ম হয়নি। কারণ চন্দ্রের কাছে তার পূর্বজীবনের কথা অজানা।

তবে তার মনে হয়েছে, অনেকের বাবা-মা আছে, আবার অনেকের কেউ নেই। অনেক লোকের বাড়িঘর আছে, আবার কেউ কেউ সিঁড়ির নিচে ঠাঁই পেয়েছে। কেউ গালি দেয়, কেউ গালি সহ্য করে। কেউ খেটে মরে, আর কেউ আদেশ দিয়েই খালাস। এই তো দুনিয়ার নিয়ম। এই রীতি চলতে থাকবে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই ধারা, উঁচু শ্রেণী আর নিচু শ্রেণী। এই বৈষম্য কেন সৃষ্টি হয়েছে, কবে থেকে; কেন, কিভাবে এই বৈষম্য দূর করা যায়। এসব সে কিছুই জানে না। এ ব্যাপারে সে উৎসাহী নয়। তবে অনেক গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে বুঝেছে যে, সৃষ্টিকর্তা তৈরি করে এই বাড়িতে পাঠিয়েছে এটাই তার অদৃষ্ট।

একথা বললে ভুল হবে যে, চন্দ্রের নিজের ভাগ্য সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। সে সর্বদা হাসিখুশী, মনোযোগ সহকারে কাজ করা পরিশ্রমী যুবক। রাত-দিন সে কাজে কর্মে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তার অসুখবিসুখ পর্যন্ত ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। করাচীতে সে ছিল ছোট বালক, বোম্বেতে এসে সে কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। দেহের বাদামী রং ফর্সা হয়েছে। চোখে-মুখে উজ্জ্বলতার ছাপ। তার চোখ ও ঠোঁট দেখে মনে হয় তার মা কোন অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিল। তার সবল বাহু ও স্বাস্থ্যবান দেহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ অভিজাত পরিবারে কোন সবল স্বাস্থ্যবান চাকর ছিল। হয়তো তাকে সড়কে ছুড়ে বের করে দেয়া হয়েছে।

চন্দ্র বোবা কিন্তু কানে শুনতে পায়। সাধারণত বোবা মানুষ কানেও কম শোনে। কিন্তু সে ছিল শুধুমাত্র বোবা। বাল্যকালে তার মালিক মিষ্টিওয়ালা সিদু তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল, চন্দ্রের গলায় জন্মগত কিছু সমস্যা আছে। অস্ত্রোপচার করলে ভাল হয়ে যাবে। আর কথা বলতে পারবে। কিন্তু সিদু মিষ্টিওয়ালা অপারেশনের মাধ্যমে তাকে কথা বলার যোগ্য করার চেষ্টা করেনি। সিদু ভেবেছে, এইতো ভাল আছে, চাকর শুধু শুনতে পায়, জবাব দিতে পারে না।

চন্দ্রের এই শারীরিক অসুস্থতা তার জন্য শোভাস্বরূপ। বর্তমান দুনিয়ায় মালিকদের অর্ধেক জীবন কাটে এই ভাবনায় যে, কিভাবে চাকরদের বোবা করে রাখা যায়। এজন্য পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করা হয়, পত্রিকা বের করা হয়, পুলিশ ও সেনা প্রহরা পর্যন্ত বসানো হয়। উদ্দেশ্য চাকর বাকররা নির্দেশ পালন করবে কিন্তু কোন কথা বলতে পারবে না।

চন্দ্র তো জন্মগতভাবে বোবা। মিষ্টিওয়ালা সিদু এত বোকা নয় যে, তাকে অপারেশন করে কথা বলার সুযোগ করে দেবে।

অবশ্য মনের দিক থেকে সিদু তেমন খারাপ ছিল না। বিশেষ পরিধির মধ্যে সিদু তার প্রতি বিশেষ নজর রাখতো।

চন্দ্রকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে, তার সব হাবভাব মনোভাব বুঝতো। সে চন্দ্রের উপর খুশী। সর্বদা সিদু গর্বভরে বলতো, সে চন্দ্রকে নিজের ছেলের মতো লালন পালন করেছে। কেউ কি এতিম ছেলেকে এভাবে নিজের কাছে রেখে লালন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালন করে? কিশোর চন্দ্র সিদুর বাড়িতে কাজ করতো। বড় হলে সিদু তার জন্য পৃথক কাজের ব্যবস্থা করেছে।

মিষ্টির দোকানে সে তো তদারকি করে, এখন সিদু চন্দ্রের জন্য চটপটি বিক্রির ভ্রাম্যমাণ দোকান চালুর ব্যবস্থা করেছে। কিছু দিনের মধ্যে সে চটপটি তৈরির কৌশল শিখে নিয়েছে। জলজিরা, ফুসকা, বুটের ডাল, পাপড় ইত্যাদি সে তৈরি করতে পারে। সমুচা ও আলুর চপ, রসুনের চাটনি, লাল মরিচের চাটনি, পুদিনার চাটনি, তেতুলের চাটনি, মিষ্টি চাটনি, আদার চাটনি, পিঁয়াজের চাটনি আর কতো কি সে তৈরি করতে পটু।

চন্দ্র বড় হয়েছে, এখন সে তরতাজা যুবক। তার জন্য একটি ভ্রাম্যমান গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। এই চার চাকার গাড়ি নিয়ে সে চটপটি বিক্রি করবে। দৈনিক বেতন দেড় টাকা। রাস্তার মোড়ে যেখানে চন্দ্র চটপটি বিক্রি করে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, জায়গাটি সিদুই পছন্দ করেছে। রাস্তার চার মাথার মোড়ে একদিকে ইউনিয়ন ব্যাংক, অন্যদিকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, তৃতীয় দিকে ইরানী দোকান, পূর্বদিকে ঘোড়বন্দ রোড এসে মিলিত হয়েছে। সন্ধ্যায় এখানে তরুণ-তরুণীদের ভিড় হয়। চন্দ্রের তাজা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চটপটি অত্যন্ত সুস্বাদু বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

সে বোবা কিন্তু তার হাসি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ব্যবসা ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত পাকা। গ্রাহক কি চায় তা সে তাদের চাহনি দেখেই বুঝতে পারে। সন্ধ্যে বেলায় তার ঠেলার চারিদিকে তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমে। চন্দ্রের দৈনিক বেতন ছিল দেড় টাকা, এখন তার বেতন তিন টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। চন্দ্র দেড় টাকা বেতনে যেমন খুশী ছিল, এখন তিন টাকা বেতনেও সে খুশী। কারণ হাসিখুশী থাকাই তার স্বভাব। সে কাজ করেই আনন্দ পায়, আর তার কর্তব্য সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সজাগ। নিজের গ্রাহকদের সে খুশী করতে বেশ পটু। সারাদিন সে চটপটি তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। বিকেল ৪টায় সে চটপটির গাড়ি নিয়ে মোড়ে হাজির হয়। রাত আটটা পর্যন্ত অবিরাম তার চটপটি বিক্রি চলে। রাত আটটা বাজার আগেই তার চটপটি বিক্রি শেষ। আর সে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরে। রাতের আহার সেরে সিনেমা দেখতে যায় চন্দ্র। রাত বারোটায় সিনেমা দেখে ফিরে এসে সিঁড়ির পেছনে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার কাজে ব্যস্ত।

এটাই তার দৈনন্দিন জীবন। এটা তার জগত। মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কেউ নেই, অতএব এদের নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। চিন্তামুক্ত জীবন। অন্যান্যদের অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকে। তার মাত্র একটিই বাড়ি। তার কোন সঙ্গী নেই। সে বিজোড়, একা। তরুণী পারু তাকে ক্ষেপিয়ে আনন্দ পায়। কানে রূপার দুল, পায়ে মল পরে বান্ধবীদের নিয়ে সদলবলে হাজির হতো পারু।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দহিবড়ার পাতিল চেটে খেয়ে ফেলতো আর তলায় সামান্য কিছু থাকতেই চন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলতো, "হে বোবা, তুমি কি কানেও কম শোনো? আমি কি দইবড়া চেয়েছিলাম? এখন এর পয়সা কি তোমার বাবা দেবে?" একথা বলার পর দইবড়ার খালি মাটির হাঁড়ি মাটিতে ফেলে দিতো পারু।

চন্দ্র তাড়াতাড়ি আবার দইবড়া তৈরি করে দেয়। পারু এবারও পাতিল নিঃশেষ করে সামান্যটুকু বাকি থাকতে রেগে বলতো, 'এতো মরিচ দিয়েছ, ঝাল কি রকম? চাটনিও তৈরি করতে জান না। ঠেলা নিয়ে এখানে কি জন্য এসেছ?'

একথা বলার পর পারু চাটনির বাটি হাতে নিয়ে ঝুলাতে ঝুলাতে বলতো, এখনই বড় পাতিলে এঁটো চাটনি ঢেলে দেবো। এই দৃশ্য দেখে তার বান্ধবীরা হাসতো, তালি দিতো। চন্দ্র দু'হাত নেড়ে ইশারায় তাকে নিষেধ করতো আর মাটির বাটি মাটিতে ফেলে দেয়ার অনুরোধ করতো।

"তাহলে তোমার বুটের থালায় ঢেলে দেবো?" জেনেশুনে সে এসব দুষ্টুমি করতো আর চন্দ্র মাথা নেড়ে নিষেধ করতো আর ঘাবড়ে যেতো।

পারু খিলখিল করে হেসে মাটি থেকে এক চিমটি মাটি তুলে নিয়ে বলতো. "তাহলে মাটি দইয়ের হাঁড়িতে ঢেলে দেবো?"

এতে চন্দ্র আরও ঘাবড়ে যেতো আর দু'হাত নেড়ে নিষেধ করতো।

অবশেষে পারু ধমক দিয়ে অর্ডার দিতো, "তাড়াতাড়ি আলুর ছয়টি টিক্কা, আর মশলাযুক্ত চনা আদাসহ দাও। নচেৎ ...।"

চন্দ্র আনন্দচিত্তে তার অর্ডারমতো খাবার সরবরাহ করতো। পারু তার বান্ধবীদের নিয়ে আলুর টিক্কা খেতে মত্ত হতো।

আবার কখনও পারু পয়সার হিসাব নিয়ে ঘাপলা করতো।

ষাট পয়সার টিক্কা, ত্রিশ পয়সার ফুসকা, দইবড়া তো চাইনি। এর পয়সা পাবে না। মোট নব্বই পয়সা, কালকের বাকি ১০ পয়সা, মোট এক টাকা।

বোবা চন্দ্র পয়সা নিতে অস্বীকার করে আর সে একবার পারুর কৌতূহলি চোখের দিকে আর একবার তার হাতে ধরা নতুন একটাকার নোটটির দিকে তাকায়। নতুন করে হিসাব করতে থাকে। দইবড়ার হাঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে চন্দ্র যেন বলছে, "দইবড়া তো খেয়েছো, এর পয়সা কেন দেবে না?" পকেট থেকে ত্রিশ পয়সা বের করে পারুকে দেখিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বললো, "দইবড়া খাওয়ার জন্য ত্রিশ পয়সা দিতে হবে।"

পারু দুষ্টুমি করে বলল, "ত্রিশ পয়সা আমাকে ফেরত দিচ্ছ, দাও।"

চন্দ্র হাত পেছনে সরিয়ে নিয়ে অস্বীকার জানায়, যেন ইঙ্গিতে বলল, "ত্রিশ পয়সা ফেরত নয়, পারুকেই দিতে হবে।"

পারু রেগে বলল, "বেটা হাত পেছনে রাখ, নচেৎ জুতাপেটা করবো।"

এ অবস্থায় চন্দ্র ঘাবড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারুর বকাবকিতে চন্দ্র ভয় পায়। সে অসহায় দৃষ্টিতে পারুর দিকে তাকিয়ে থাকে। পারুর দয়া হয়, পকেট থেকে পুরো পয়সা বের করে দিয়ে দেয়। তারপর বলে, "তুমি হিসাবে ঘাপলা করো, কাল থেকে আর তোমার দোকানে আসবো না।"

আবার পরের দিন পারু এসে হাজির হতো। চন্দ্রকে উত্ত্যক্ত করে সে আনন্দ পায়। এখন চন্দ্রও পারু উত্ত্যক্ত করলে মজা পায়। পারু না এলে তার গ্রাহক সংখ্যায় তেমন তারতম্য হতো না। তবে চন্দ্রের কাছে ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো। তবে চন্দ্র যেখানে ঠেলাগাড়ি রাখতো তার সামনে গলি থেকে পারু আসতো। চন্দ্র আগে ইউনিয়ন ব্যাংকের সামনের মোড়ে গাড়ি রাখতো। এখন আস্তে আস্তে সে গাড়ি নিয়ে পারুদের গলির মুখে এসে হাজির হয়। গাড়ির স্থান পরিবর্তনে প্রথমদিন পারু রেগে যায়, বললো, "কি ব্যাপার, বোবা বেটা গাড়ি এখানে নিয়ে এসেছ কেন?"

চন্দ্র ইশারায় দেখায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে ক্যাবলের পাইপ বসানোর জন্য মাটি খোঁড়াখুঁড়ি চলছে।

তার যুক্তি অত্যন্ত শক্ত। অতএব, পারু চুপ হয়ে যায়। ক্যাবল বসানোর কাজ শেষ হলেও চন্দ্র গাড়ি আর সরায়নি। এখানেই থেকে যায়। পারু কোন রা করেনি। বরং তাকে উত্ত্যক্ত করার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। পারুর সাথে তার বান্ধবীরাও তাকে উত্ত্যক্ত করে, সঙ্গে কিছু ছোট ছোট ছেলে। অবশ্য চন্দ্র ছেলেদের বকা দিলে ওরা পালিয়ে যেতো।

একদিন চন্দ্র তাদের উত্ত্যক্তের জন্য বিরক্ত হয়ে পারুর বান্ধবীদেরও বকা দেয়। ফলে পরবর্তী তিন-চারদিন পারু তাকে আর উত্ত্যক্ত করেনি। এতে চন্দ্রের মনে হয়েছে, তার মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে, পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। সে চায় পারু তাকে উত্ত্যক্ত করুক। কিন্তু পারুর স্বভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। চন্দ্র নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়।

একদিন চন্দ্র নিজেই হিসাবে ঘাপলা করে বসে হিসাবে মোট সোয়া এক টাকা পাওনা, সে পারুর কাছে পৌনে দুই টাকা চেয়ে বসে। দু'জনের তুমুল ঝগড়া। অবশেষে চন্দ্র নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ অতীতের সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

চন্দ্র অত্যন্ত খুশী। কারণ পারু আবার তার বান্ধবীদেরসহ তাকে ক্ষেপায়, উত্ত্যক্ত করে। পারুর পায়ের মলের রিনিঝিনি শব্দ, আর দুষ্টুমিভরা হাসি, ফুলঝুরির মতো তার বিরান হৃদয়ের মরুভূমিকে আলোকিত করে তোলে। আবার যখন পারু তার বান্ধবীদের সাথে কদম মিলিয়ে চলে যায়, তখন সে পারুর মলের শব্দ যেন পৃথকভাবে শুনতে পায়। তার বান্ধবীরাও পায়ে মল পরে। তবে পারুর পায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মলের শব্দ সঙ্গীতের সুরের ন্যায় তার কানে নয় বরং হৃদয়ের অতল গহবরে পর্যন্ত ধ্বনিত হয়। এতেই সে খুশী, এর বেশি সে চায় না।

হঠাৎ বিপদ নেমে আসে। নতুন ডিজাইনের একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে নতুন চটপটিওয়ালার আবির্ভাব। ঠেলার চারদিকে ঝলমলে কাঁচ লাগানো। উপর নিচে ডানে বায়ে চারদিকে লাল, নীল, বেগুনী রংয়ের কাঁচ লাগানো। গ্যাসের দু'টি হ্যাজাক। পিতলের বদলে ক্রেতাদের খাবার জন্য কাঁচের প্লেট। ঠেলাওয়ালার একজন কিশোরও সহকারী হিসেবে ছিল। ছেলেটির কাজ গ্রাহকদের খাবার সরবরাহ ও নেপকিন বানিয়ে দেয়া আর পানি পান করানো। চাটনিওয়ালার পানির কলসির গলায় আবার মালাও পরিয়ে দিয়েছে। নতুন চটপটিওয়ালা গ্রাহকদের হাতে প্লেট তুলে দিয়ে একবার বোবা চটপটিওয়ালার দিকে তাকায় আর বলতো, "খেয়ে দেখুন"।

ধীরে ধীরে বোবা চটপটিওয়ালার গ্রাহক সব নতুন ঠেলাওয়ালার দিকে ঝুঁকে পড়ে। চন্দ্র এতে তেমন উদ্বিগ্ন ছিল না। কারণ সে ভাবতো, গ্রাহকরা পরে তার কাছে ফিরে আসবে। কারণ তার খাঁটি মশলাযুক্ত চটপটির কাছে সে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। সে জেনেছে, নতুন চটপটিওয়ালার বাহ্যিক রংচং ও অতিরিক্ত সার্ভিস সত্ত্বেও তাদের কাছে ওর চটপটি তেমন পছন্দ হচ্ছে না। চন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগের সাথে চটপটি তৈরিতে মগ্ন থাকে। হঠাৎ তার কানে পায়ের মলের শব্দ ভেসে আসে। চোখ তুলে সেদিকে তাকায়।

গলি থেকে পারু তার বান্ধবীদের নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে আসছে। যেন মহাশূন্যে আবাবীল পাখি আকাশে উড়ে এদিকে আসছে। চন্দ্রের বুক কাঁপছিল। প্রথমে ওরা চন্দ্রের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ থেমে যায়, তার বান্ধবীরাও থমকে দাঁড়ায়। চন্দ্র পারুর দিকে তাকায়। পারুও চন্দ্রের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এরপর বান্ধবীদের নিয়ে পারু নতুন চটপটিওয়ালার কাছে হাজির হয়।

শেষ পর্যন্ত পারু তুমিও সেখানে পারু তুমি? রাগে চন্দ্রের মুখমন্ডল লাল হয়ে ওঠে। শিরা-উপশিরায় ঘুমের নেশা জেগে ওঠে। দেহের সমুদয় রক্ত যেন মুখে এসে জমাট বেঁধেছে। যেন সে কথা বলার চেষ্টা করছে। আর চীৎকার করে বলতে চায়, "পারু তুমিও শেষ পর্যন্ত ..... পারু তুমি .....?

রাগে তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল। অবশ্য পরে নিজেকে সামলে নিয়ে গ্রাহকদের দিকে মনোযোগ দেয়।

এদিকে পারু ও তার বান্ধবীরা হৈ-চৈ করে নতুন চটপটিওয়ালার কাছে চটপটি খাচ্ছিল। পারুর কণ্ঠস্বর ছিল সকলের উর্ধ্বে। বলছিল, "আহ, কি মজাদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাটনি।" আবার চন্দ্রের দিকে ইশারা করে বলছিল, পুরাতন ঠেলাওয়ালা চাটনি তৈরির কায়দা-কানুন জানে না। কেমন নোংরা। সাতদিন যাবৎ গোসল করেনি। আর নতুন চাটনিওয়ালা কি পরিষ্কার। ও-বেটার একটি ন্যাপকিন পর্যন্ত নেই। হাত মুছতে চাইলে নোংরা গামছা এগিয়ে দেয়।"

ঘৃণাভরে ঠোঁট বাঁকিয়ে পারু আরও বলল, "আমি কখনও ঐ চটপটিওয়ালার মুখেও থুথু ফেলব না।"

চন্দ্র অসহায়, কি করবে? হঠাৎ চীৎকার করে নিজের ঠেলা ছেড়ে এগিয়ে যায় চন্দ্র, আর নতুন চটপটিওয়ালাকে বেদম পেটাতে থাকে। মেয়েরা চীৎকার করে পেছনে সরে যায়। চন্দ্রের পিটুনি থেকে দোকানের কিশোরটিও রক্ষা পায়নি। সে নতুন ঠেলাগাড়ির কাঁচ ভেঙে ফেলে, খাবার সামগ্রীসহ ঠেলাগাড়ি উল্টে রাস্তায় ফেলে দেয়। তারপর রাস্তার উপর একা দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আদালতে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাকে দুই মাসের কারাদণ্ড আর পাঁচ টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করে। জরিমানা অনাদায়ে আরও চারমাসের কারাভোগের আদেশ দেয়।

সিদু মিষ্টিওয়ালা তার জরিমানার টাকা আদায় করেনি। ফলে চন্দ্রকে ছয়মাস পুরো জেল খাটতে হয়েছে। তাছাড়া তার মালিক সিদু ছাড়া কে তার জরিমানা আদায় করবে।

জেল খাটার পর মুক্তি পেয়ে চন্দ্র আবার সিদু মিষ্টিওয়ালার কাছে হাজির। তাছাড়া সে যাবে বা কোথায়? তার তো আর কোন ঠিকানা নেই। সিদু তাকে তিরস্কার করতে থাকে আর চন্দ্র মাথা নীচু করে তার বকাবকি নীরবে শুনে যায়। সে বোবা না হলেও তার কিইবা জবাব দিতো। সেতো নতুন চটপটিওয়ালাকে মারধর করে অপরাধ করেছে। তদুপরি পারুর পায়ের মলের রিনিঝিনি শব্দ শোনার জন্য ব্যাকুল হওয়া ছিল তার অপরাধ।

সিদু তাকে প্রাণভরে গালিগালাজ করে আবার কাছে নিয়ে নেয়। চন্দ্র অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সৎ কর্মচারী। জেল খেটে কিছুটা চেতনা হয়েছে। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া ঠিক নয়। তার পরিণতি এমনি হয়ে থাকে। সব কিছু বুঝিয়ে সুজিয়ে তিনদিন পর চন্দ্রকে আবার চটপটির ঠেলা নিয়ে একই রাস্তার মোড়ে পাঠনো হল।

চন্দ্রের ঠেলাগাড়ি নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়েছে, নতুন রঙিন কাঁচ লাগানো হয়েছে, পিতলের জগের পরিবর্তে কাঁচের জগ আর নতুন চামচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চন্দ্র আবার চটপটির ঠেলা নিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে রওয়ানা হয়। ইউনিয়ন ব্যাংক পার হয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেলাওয়ালা দখল করে নিয়েছে। একই ঠেলাওয়ালা আর তার সহকারী কিশোর ছেলেটি সঙ্গে ছিল। সে চন্দ্রের দিকে তাকায়। চন্দ্র মুখ ফিরিয়ে নেয় আর নতুন ঠেলাওয়ালা থেকে কিছু দূরত্বে গিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে গিয়ে গাড়ি থামায় আর গ্রাহকদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

চারটা বাজে, পাঁচটা বাজে তখনও কোন গ্রাহক তার দোকানে আসেনি। একজন মাত্র গ্রাহক এসেছে, অচেনা অজানা। পাঁচ-ছয় আনার চটপটি খেয়ে চলে যায়। বিষণ্ন মনে চন্দ্র নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। কখনও তোয়ালে নিয়ে কাঁচ মুছতে থাকে, আবার হাঁড়িতে চামচ দিয়ে টক মসলা নাড়া দেয়। হাতের তালুর টক চাটনি নিয়ে যাচাই করে দেখে। আলু দিয়ে, মটর ও ডাল দিয়ে টিকা তৈরি করতে থাকে।

হঠাৎ পায়ের মলের শব্দ তার কানে এসে বাজে। তার হৃদকম্পন বেড়ে যায়। দেহে রক্তের প্রবাহ যেন সচল হয়ে ওঠে। সে মাথা তুলে উপরের দিকে তাকায়। পায়ের মলের ঝুন ঝুন শব্দ তখন সড়কের উপর এসে পড়েছে।

সে মাথা তুলে তাকায়, পারু এগিয়ে আসছে। পারুর দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। তার হাত থেকে দইয়ের চামচ মাটিতে খসে পড়ে। কাঠি থেকে তোয়ালে বালটিতে পড়ে ভিজে যায়। একজন গ্রাহক কাছে এসে দু'টি 'সমুচা' কিনতে চায়।

কিন্তু চন্দ্রের কানে কোন কথাই প্রবেশ করেনি। তার সমস্ত দেহের আবেগ-অনুভূতি যেন চোখে এসে জমায়েত হয়েছে। সারাদেহ যেন তার চোখ আর চোখের দৃষ্টি পারুর দিকে নিবদ্ধ। শুধু দেখছে, পারু কোন দিকে যায়।

ধীরকণ্ঠে আলাপচারিতার মাঝে পারু ও তার বান্ধবীরা এগিয়ে আসছে দু'টি চটপটির ঠেলার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে, মেয়েরা নতুন ঠেলাওয়ালাকে চারদিকে ঘিরে ধরে।

কিন্তু চন্দ্রের দৃষ্টি ছিল ঠেলাওয়ালা নয়, পারুর দিকে। পারু চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ পারু বান্ধবীদের ছেড়ে চন্দ্রের ঠেলার কাছে এসে হাজির। আর নীরবে একজন অপরাধীর ন্যায় তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন আর চন্দ্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি, ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। এ যেন অশ্রু নয়, কৃতজ্ঞতার কথকতা। তার অভিযোগের জবাব যেন অশ্রুরূপে তার বক্তব্য পেশ করছে আর তা চন্দ্রের দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে। পারু তখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

আজ পারু যেন বোবা আর চন্দ্র কথা বলছে। কথা বলছে চন্দ্রের অশ্রু। আর পারু বা কিভাবে তাকে বুঝাবে যে, সে বিগত ছয় মাস যাবৎ তার এই অশ্রুর জন্য অপেক্ষায় ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পূর্ণিমার রাতের প্রেম

তখন ছিল এপ্রিল মাস। বাদামের গাছ ফুলে ভরপুর। আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বসন্তের মাধুর্য এসে পড়েছিল। উঁচু ও বড় পাহাড়ের নিচে মখমলের মতো কোমল সৌন্দর্য মাঝে মাঝে বরফের টুকরোগুলোকে সাদা ফুটা ফুলের মতো দেখাচ্ছিল। আগামী মাসে এই সাদা ফুল ঘাসে ডুবে যাবে এবং ঘাসের রং ঘন সবুজ আকার ধারণ করবে। আর বাদামের শাখার উপরে সবুজ বাদাম পুষ্পরাগমণির ঝলমল করবে এবং নীল পাহাড়ের মুখাবয়ব থেকে কুয়াশা সরে যাবে। আর এই ঝিলের ব্রিজের পায়ে চলা পথের ধূলা ভেড়ার সুপরিচিত ব্যা শব্দে ডেকে উঠবে। আর তারপর উঁচু ও বড় পাহাড়ের নিচে রাখালেরা ভেড়ার শরীর থেকে বেড়ে উঠা মোটা মোটা পশম গরমে ছাড়িয়ে নেবে আর গাইতে থাকে গান।

তখনও এপ্রিল মাস। পাতা ঝরে পড়েনি। পাহাড়ের উপরে বরফের কুয়াশা আছে। পায়ে চলা পথের বুক ভেড়ার দলের শব্দে গুঞ্জরিত হয়নি। ঝিলের গভীর সবুজ জল নিজের বুকের মধ্যে সেই হাজারো রূপকে লুকিয়ে রেখেছে যা বসন্তের আগমনে হঠাৎ এর বুকে এক সরল ও পবিত্র হাসির মতো প্রকাশিত হবে। পুলের ধারে ধারে বাদাম গাছের শাখার উপর মুকুল ঝলমল করছিল। এপ্রিলের শীতের শেষ রাতে যখন বাদামের ফুল জেগে উঠে আর বসন্তের দূত হয়ে হ্রদের পানিতে নৌকা ভাসায়। ফুলের ছোট ছোট পাতাগুলো পানির বুকে নৃত্যরত ও কম্পমান হয়ে বসন্তের আগমনের দৃশ্য বয়ে আনে।

পুলের জঙ্গলের ধারে আমি বহুক্ষণ যাবত তার জন্য প্রতিক্ষা করছিলাম। বিকেল চলে গেল। সন্ধ্যা এল। উলর হ্রদের নৌকাগুলো পাথরের গম্বুজের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল আর এগুলোকে আকাশের সীমারেখায় কাগজের নৌকার মতো দুর্বল ও অসহায় মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যায় লালিমা আকাশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ল। লাল থেকে ধূসর । ধূসর থেকে কাল হয়ে গেল। যতক্ষণ না বাদাম গাছের সারির দিকে পথ আর রাতের নীরবতায় আকাশে রাতের প্রথম তারা পথিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গানের মতো জেগে উঠল। বাতাসের শীতের প্রবাহ আরও জোরদার হল আর নাকের ডগা শীতের আমেজে অবশ হওয়ার উপক্রম।

আকাশে জ্যোৎস্না উঠল।

আর সে এসে হাজির।

দ্রুতপদে চলতে চলতে-আর পায়ে চলা পথে দৌড়াতে দৌড়াতে সে আমার সামনে এসে হাজির আর ধীর কণ্ঠে বলল, 'হায়'!

তার শ্বাস জোরে জোরে পড়ছিল। আবার থামল। আবার জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। সে হাত দিয়ে কাঁধ স্পর্শ করল এবং সেখানে তার মাথা রাখল। তার গভীর কালো চুলের গোছা যেন আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছিল। আমি তাকে বললাম, বিকেল থেকে তোমার প্রতীক্ষা করছি।

'এখন রাত হয়েছে, অপূর্ব সুন্দর রাত।' একথা বলে সে তার দুর্বল হাতটি আমার কাঁধে রাখে। মনে হল, বাদামের ফুলে ভরা শাখা ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধে এসে শুয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে থাকল। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর নিজে নিজে হাসল-বলল, বাবা এই পথের মোড় পর্যন্ত আমার সাথে এসেছিল। কারণ আমি তাকে বলেছিলাম, আমার ভয় করছে। আজ আমাকে আমার বান্ধবী রাজার বাড়িতে ঘুমুতে হবে। অবশ্য ঘুমুতে পারবো না, রাত জাগতে হবে। কারণ বাদামের প্রথম মুকুলের আনন্দে আমরা বান্ধবীরা সারারাত জেগে গান করবো। আমি তো বিকেল থেকেই তৈরি হচ্ছিলাম এখানে আসার জন্য। কিন্তু ধান পরিষ্কার করতে হল। আর শুকাতে হল এই কাপড়ের জোড়া ধুয়ে আজ। উনানের আগুনেই শুকালাম। মা জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিল। তিনি তখনও ফেরেননি। তিনি না এলে তোমার জন্য ভুট্টার দানা, শুকনো খুবানি আর জর্দালু আনব কি করে? এসবই তোমার জন্য এনেছি দেখো। তুমি হয়তো রেগে আমার জন্য অপেক্ষা করছো? আমার দিকে তাকাও। আমি তো এসে গেছি আর আজ পূর্ণিমার রাত। এসো ঝিলের ধারে বাঁধা নৌকা খুলে নিয়ে ঝিলে বেড়াই।

সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আর আমি হতবাক দৃষ্টিতে তার ভালবাসায় ভরা চোখের তারার দিকে চেয়ে রইলাম, যার মধ্যে তখন চাঁদ চমক দিচ্ছিল। আর এই চাঁদ আমাকে যেন বলছিল- যাও নৌকা খুলে হ্রদে ভ্রমণ করো।

আজ বাদামের প্রথম মুকুল ফোটার আনন্দের পার্বণ। আজ তোমার জন্য নিজেই বান্ধবী, ছোট বোন, বাবা, বড় ভাই সকলকেই ফাঁকি দিয়ে এসেছি। কারণ আজ জ্যোৎস্না রাত আর বাদামের সাদা মুকুল বরফের তুলার গোল্লার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর কাশ্মীরের গান বুকের শিশুর মতো উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। তার গলায় তুমি মোতির এই সাতনরির হার দেখেছো। এই সাতনরির লাল হার আমি তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললাম-তুমি আজ সারারাত জেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। আজ কাশ্মীরের বসন্তের প্রথম রাত। আজ তোমার গলা থেকে কাশ্মীরের গান এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে, চাঁদনী রাতে জাফরানের পাতায় যেমনভাবে ফুল ফুটে। চাঁদে যেন আকাশ থেকে হতবাক ও বিস্মিত নেত্রে উঁকি দিয়ে এসব দেখছে আর হঠাৎ কোন গাছে এক বুলবুলি গান গেয়ে উঠল, নৌকার প্রদীপ ঝিলের পানিতে

ঝিলমিল করতে লাগল এবং পাহাড়ের সমস্ত বস্তিতে গানের আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠল। ছাদ থেকে ভেসে আসছে গান, ছোটদের কোলাহল, পুরুষের ভারী আলাপচারিতার আওয়াজ, আর শিশুদের কান্নার মিষ্টি শব্দ আর সন্ধ্যার ধোঁয়া আর খাবারের গন্ধ, মাছ আর ভাত, আর কারামের শাকের গরম নোনতা সুবাস এবং জ্যোৎস্না রাতের বসন্ত ছড়ানো যৌবন। আমার আর রাগ নেই। আমি তার হাত ধরে বললাম, চলো ঝিলে ঘুরে আসি। পুল, পায়ে চলার পথ, বাদাম গাছের সারি, খোঁয়াড় সব পেছনে ফেলে এসেছি। আমরা ঝিলের ধার দিয়ে এগিয়ে চলছি।

ঝোপের মধ্যে ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঝি আর ভেড়ার অসময়ের ডাক যেন সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল। এক ভয়ঙ্কর ঐক্যতান ও ঘুমন্ত ঝিলের মধ্যে চাঁদের নৌকো দাঁড়িয়েছিল। সাথী চুপচাপ। ভালবাসার প্রতীক্ষায়, হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ও তার ভালবাসার প্রতীক্ষায়; তোমার ও তোমার প্রিয়ার হাসির প্রতীক্ষায়। মানুষ মানুষকে চাওয়ার অপেক্ষায়, এই পূর্ণিমার সুন্দর পবিত্র রাতে কোনো কুমারীর ছায়াহীন দেহের মতো ভালবাসার আবেগের প্রতীক্ষারত।

নৌকা খুবানির একটি গাছের সাথে বাঁধা ছিল, যে গাছটি একেবারে ঝিলের পার ঘেঁষে জন্মেছিল। এখানে মাটি নরম ছিল আর চাঁদের আলো পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছিল। আর ব্যাঙ ঘ্যানর ঘ্যানর গান গেয়ে চলেছিল আর ঝিলের পানির ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছিল আর সেই শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে। আমি দু'হাতে তার কোমরে ধরে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। ঝিলের পানি বারবার তীরে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। আমি প্রথমে তার চোখে চুম্বন দিলাম, আর ঝিলে যেন লক্ষ পদ্ম ফুল ফুটে উঠল। তারপর আমি তার মুখে চুম্বন দিলাম, মনে হল, নরম হাওয়ার হালকা দমকা যেন শত শত কোরাস গান গাইছে। এবারে আমি তার অধরে চুম্বন দিলাম, আর লাখো মসজিদ, মন্দির, গির্জার, প্রার্থনার শব্দ জোরালো হয়ে উঠল, মাটির ফুল ও আকাশের তারা হাওয়ার উড়ন্ত মেঘ সকলে মিলে যেন নাচতে লাগল। এবারে আমি তার চিবুকে চুমো দিলাম, তারপর তার ঘাড়ে, যেন পদ্মফুল ফুটতে ফুটতে কুঁকড়ে গেল ফুলের কুঁড়ির মতো। এখন সেই ব্যাঙের ডাক, ঝিলের পানির কোমল ঢেউয়ের দাপাদাপি আর অন্যদিকে একজন আমার বুকের সাথে একাকার হয়ে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আমি আস্তে আস্তে নৌকা খুললাম। সে নৌকায় বসে পড়ল। আমি দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকটি বেয়ে ঝিলের মাঝখানে নিয়ে গেলাম। সেখানে নৌকা আপনা আপনি থেমে গেল-আর কোন দিকে এগুচ্ছে না। আমি দাঁড় তুলে নৌকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখলাম। সে পুঁটলি খুলে তার থেকে জরদালু বের করে আমাকে দিল, নিজেও খেতে লাগল। জরদালু ছিল শুকনো অম্লমধুর।

সে বলল, এগুলো গত বসন্তের। আমি জরদালু খেতে খেতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে ধীরে ধীরে বলল, গত বসন্তে তো তুমি ছিলে না। আসলে গত বসন্তে আমি আসিনি। আর জরদালুর গাছ ফুলে ভরে গিয়েছিল। আর ডাল সামান্য ঝাঁকালেই ফুল ঝরে পড়ত মাটির উপরের মুক্তোর মতো পড়ত ছড়িয়ে। সবুজ জরদালু, শক্ত টক জরদালু যা মুনলঙ্কা দিয়ে খাওয়া হত, জিভে ঝাল লাগতো আর নাক দিয়ে পানি ঝরে পড়তো। তবুও টক জরদালু খাওয়া বাদ পড়তো না। গত বসন্তে আমি ছিলাম না, আর এই সবুজ জরদালু পেকে হলদে সোনালী আর লাল হয়ে উঠেছিল। আর ডালে ডালে লাল কুঁড়ি ঝুমঝুম করছিল। গত বসন্তে কিন্তু আমি ছিলাম না আর তার সুন্দর হাত লাল লাল জরদালুগুলো একখানে করে নিয়েছিল। সুন্দর ঠোঁট তার টাটকা রস চুষেছিল এবং সেগুলো তাদের ঘরের ছাদে নিয়ে গিয়ে শুকোবার জন্য রেখে দিয়েছিল। ভেবেছিল যে যখন এই ফুল শুকিয়ে যাবে, আর বসন্ত চলে যাবে এবং অন্য বসন্তের আগমন আসন্ন হবে, তখন কিন্তু আমি আসব আর এসব ফলের স্বাদ গ্রহণ করবো। জরদালু খাওয়ার পর আমি শুকনো খুবানি খেলাম। খুবানি প্রথমে তো খুবই মিষ্টি লাগে কিন্তু যখন মুখের লালায় গলে যায় তখন একেবারে চিনি আর মধুর স্বাদ।

এগুলো নরম আর খুব মিষ্টি, আমি বললাম। সে একটি দাঁত দিয়ে ভেঙে তার বিচি বের করে আমাকে দিয়ে বলল, খাও। বিচি বাদামের মতো মিষ্টি ছিল। এমন খুবানি আমি কখনও খাইনি।

সে বলল, আমাদের আঙিনার গাছের ফল এগুলো। একটিই আমাদের খুবানি গাছ আছে। কিন্তু এত বড় আর লাল ও মিষ্টি খুবানি হয় তা বলার নয়। খুবানি পাকলে আমার সব বান্ধবীরা একত্রিত হয়ে আমাকে খুবানি খাওয়াতে বলে।

আমি ভাবছি, গত বসন্তে আমি ছিলাম না কিন্তু খুবানি গাছ আঙিনায় এইভাবেই দাঁড়িয়েছিল। গত বসন্তে গাছটি কোমল পাতায় ভরে গিয়েছিল আর তার মাঝে কাঁচা খুবানির ফল ঝুলছিল। তখন এই খুবানিতে আঁটি হয়ে গিয়েছিল এবং এই কাঁচা টকফল দুপুরের আহারের সাথে চাটনির কাজ করছিল। গত বসন্তে কিন্তু আমি ছিলাম না আর এই খুবানির রঙ হালকা সবুজ হতে শুরু করেছিল, আর আঁটির ভেতর ছিল নরম। দানার স্বাদ সবুজ বাদামকে পর্যন্ত হার মানায়। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। আর লাল খুবানির রঙ এত সুন্দর ছিল যেন কাশ্মীরী কুমারীর রঙ। সবুজ সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছিল। আর মেয়েরা আঙিনায় নাচতে শুরু করেছিল। আর ছোট ভাই গাছে চড়ে খুবানি পেড়ে পেড়ে তার বোনের বান্ধবীদের জন্য ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল। কী মিষ্টি ছিল এই গত বসন্তের খুবানিগুলো-তখন কিন্তু আমি ছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবানি খেয়ে সে ভুট্টা বের করলো। কী সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সোনালী রং-এর সেঁকা ভুট্টা আর মচমচে নির্মল স্বচ্ছ মুক্তোর মতো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। মজার স্বাদ বয়ে আনে মধুর মতো।

সে বলল, এটা মিশরের মকাই ভুট্টা। আমি ভুট্টা খেতে খেতে বললাম, দারুণ মিষ্টি।

সে বলল, গত মৌসুমে মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে কলসীর মধ্যে শুকিয়ে রেখেছিলাম। সে ঐ জায়গা থেকে খেল এবং কিছু আমার জন্য রেখে দিল।

আমি তো খেতে লাগলাম। একইভাবে আমরা দুইজনে একই ভুট্টা থেকে খাচ্ছিলাম। আমি ভাবলাম এ হল মিশরের ভুট্টা-কি মিষ্টি তাই না। যখন তুমি ছিলে কিন্তু আমি ছিলাম না। যখন তোমার বাবা ক্ষেতে লাঙল চালিয়েছিল, ক্ষেতে মই দিয়েছিলেন, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়েছিল, জমি সবুজ রঙের ছোট ছোট চারা গজেছিল, যেখানে তুমি আগাছা পরিষ্কার করেছিলে, তারপর চারা সবুজ হয়েছে, ওদের মাথায় শিষ দুলছিল এবং তা হাওয়ায় দুলছিল। আর তুমি মকাইয়ের চারার উপর সবুজ সবুজ ভুট্টা দেখতে গিয়েছিলে। আমি যখন ছিলাম না, তখন ভুট্টার ভেতরে দানা গজিয়েছিল, দুধভরা দানা, যার কোমল পর্দার সামান্য নখ লাগলেও দুধ বেরিয়ে পড়তো। এমন নরম ও কোমল ভুট্টার জন্ম দিয়েছিল এই মাটি। কিন্তু তখন আমি ছিলাম না। এই ভুট্টা মোটা ও তাজা হয়েছে। তার রস হয়েছে-পাকা আর শক্ত হয়েছে। এখন ভুট্টায় নখ লাগলে কিছু হয় না। বরং নিজের নখই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ভুট্টার গুচ্ছ প্রথমে হলদে তারপর সোনালী এবং শেষে ভুট্টার রং মাটির মতো ধূসর হয়ে যায়। আমি কিন্তু তখন ছিলাম না। আবার ক্ষেতে খামার হল। খামারে বলদ চলল আর ভুট্টা থেকে দানা পৃথক হতে চলল। তুমি নিজের বান্ধবীদের নিয়ে প্রেমের গান গেয়েছিলে আর কিছু ভুট্টা লুকিয়ে এবং সেঁকে আলাদা করে রেখেছিলো আমার জন্য, যখন আমি ছিলাম না। পৃথিবী ছিল, সৃষ্টি আছে, প্রেমের গানও ছিল। আগুনে সেকা ভুট্টাও ছিল অথচ আমি অনুপস্থিত।

আমি আনন্দে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ পূর্ণিমার রাতে যেসব কথা শেষ হয়ে গেছে, কাল পর্যন্ত তা শেষ হয়নি। আজ শেষ হলো। সে ভুট্টা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিল। তার ঠোঁটের গরম গরম তাপের অনুভূতি তখনও এই ভুট্টায় বিদ্যমান ছিল। আমি বললাম, আমি তোমাকে চুমো খেতে চাই।

সে বলল, 'যাও অসভ্য। নৌকা ডুবে যাবে কিন্তু।' 'তা হলে কী হবে'? আমি জানতে চাই । সে বলল,'ডুবে যেতে দাও। সেই পূর্ণ চাঁদের রাত আমি আজও ভুলিনি। আমার বয়স সত্তর বছর হতে চলল। কিন্তু সেই পূর্ণ চাঁদের রাত আমার অনুভূতিতে তেমনি ঝিকমিক করছে। যেন সে এই তো গতকাল এসেছিলো। এমন পবিত্র প্রেম আমি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সাথে করিনি। হয়তো সেও কোনদিন করেনি। সে রাতটা ছিল ভিন্ন রকমের। পূর্ণিমার রাতটি আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছিল যে সে আর বাড়িতেই ফেরেনি। সেই রাতে আমার সাথে পালিয়ে এসেছিল আর আমরা পাঁচ ছয়দিন শিশুদের ভালবাসার মতো হারিয়ে গিয়েছি প্রেমের ভুবনে ওদিকে এদিকে বনের ধারে। নদী নালায় আখরোট গাছের ছায়ার ঘুরে বেড়িয়েছি। সংসার সম্পর্কে এ ক'দিন কোন খোঁজ-খবরই রাখিনি। তারপর আমি ঐ ঝিলের ধারে একটা ছোট ঘর কিনে ফেললাম। তাতে দু'জন বসবাস শুরু করি। মাসখানেক পরে শ্রীনগরে গেলাম, তাকে বলে গেলাম তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসব। তৃতীয় দিন ফিরে এসে দেখি, একজন যুবকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে সে আলাপচারিতায় মত্ত। দু'জনেই একই বাসন থেকে খাবার খাচ্ছে। একে অন্যের মুখে ফল গুঁজে দিচ্ছে, আর হাসাহাসি করছে। আমি তাকে দেখলাম কিন্তু সে আমাকে দেখতেই পায়নি। ওরা নিজেরা এতই ব্যস্ত যে, আমাকে দেখতেই পেল না। আমি ভাবলাম, এ গত বসন্ত, আগের বছরের বসন্তে আমি যখন ছিলাম না। তার প্রেমিক ছিল, আর সম্ভবত কত বসন্তই না এসেছে। আজ তোমার ঘরে শরৎ এসেছে যেমন সমস্ত বসন্তের পর আসে। এখন তোমার বা আমার কি করার আছে। এই কথা ভেবে, আমি তার সাথে দেখা না করেই চলে এলাম, আর আমার প্রথম বসন্তের সাথে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

আজ আমি আটচল্লিশ বছর পরে ওখানে এসেছি। আমার ছেলেরা সাথে রয়েছে। আমার স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু ছেলের বউয়েরা আর নাতিরা সাথে রয়েছে। আমরা ঘুরতে ঘুরতে ঝিলের ধারে এসে পড়েছি। আর এটা এপ্রিল মাস। সন্ধ্যা নামছে। আমি পুলের ধারে দাঁড়িয়ে বাদাম গাছের সারি দেখছি আর ঠাণ্ডা বাতাসে বাদামের সাদা শাখা দুলছে। পায়ে চলা পথের ধুলোয় চেনাজানা লোকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সুন্দরী এক মেয়ে পুঁটলি হাতে পুলের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল আর আমার বুক ধক করে কেঁপে উঠলো। পাহাড়ের ধারের বস্তিতে একজন মহিলা তার স্বামীকে ডাকছে। সে তাকে খেতে আসার জন্যে ডাকছিল, দূর থেকে দরজা বন্ধের আওয়াজ এল এবং একটি শিশু কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। ছাদ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। পাখির কলরব গাছের শাখায়, কিন্তু হঠাৎ সব নীরব হয়ে গেল। কেউ গান গাইছে, তার সুর তরঙ্গিত হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

আমি ব্রীজ পার হয়ে আগে আগে চলছি। আমার ছেলেরা আর তাদের বৌ বাচ্চারা আমার পিছু পিছু আসছিল। আলাদা দলে দলে ভাগ হয়ে ওরা আসছিল। ওখানে বাদাম গাছের সারি শেষ। ঝিলও শেষ হল। ঝিলের ধারে খুবানির গাছ। কত বড় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নৌকা, কিন্তু এটি কি সেই নৌকা। সামনে একটি ঘর। আমার পূর্ণিমার রাতের প্রেম আর প্রথম বসন্তের ঘর।

ঘরে আলো আছে, আর বাচ্চারা চেঁচামেচি করছে। কেউ ভারী গলায় গান গাইছে। একজন বৃদ্ধা তাকে চিৎকার করে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। আমি ভাবছি, অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে। আমি এর মধ্যে আর এ বাড়ি দেখতে পাইনি। একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলে কি দোষ আছে। আমি তো এই বাড়িটি কিনেছিলাম। আসলে আমি তো এখনও মালিক। একবার দেখলে ক্ষতি কী? আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। শিশুরা খুবই প্রিয়। এক যুবতী তার স্বামীর জন্য রেকাবিতে খাবার রেখেছে। আমাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। ঐ শিশুরা মারামারি করছিল। আমাকে দেখে অবাক হয়ে চুপ হয়ে গেল। যে বৃদ্ধা এখুনি রেগে শিশুদের ধমক দিচ্ছিল। সে আমাকে দেখে হতবাক, জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?'

আমি বললাম, এটা আমার বাড়ি। সে জানতে চাইল, 'এটা কি তোমার বাবার বাড়ি।' আমি জবাব দিলাম, 'বাপের নয় আমারই বাড়ি। আটচল্লিশ বছর আগে আমি এটি কিনেছিলাম আর এখন আমি এটা দেখার জন্য এসেছি। আপনাদের তাড়াতে আসিনি। এ বাড়ি তো এখন বলতে গেলে আপনারই আমি তো তখনই একথা বলার পর আমি চলে আসছিলাম, বৃদ্ধার আঙ্গুল শক্ত হয়ে খুঁটির সাথে এঁটে গেল। সে জোর করে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, তাহলে তুমি এত বছর পরে কেমন করে চিনবে?

সে ঘরের খুঁটির সাথে লেগেই থাকল বেশ কিছুক্ষণ। আমি নিচে আঙিনায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর সে নিজ থেকেই হেসে বলল, 'এসো আমি তোমাকে বাড়ির লোকদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। পরিচয় করিয়ে দিল, এ হল আমার বড় ছেলে, ও হল এর ছোট। এ হল বড় ছেলের বউ। এ হল ছোট ছেলের বউ। এ আমার বড় নাতি। সালাম করো বেটা। এ হল নাতনী। এ আমার স্বামী। আহ ওকে জাগাইও না। গত পরশু থেকে তার জ্বর। তাকে ঘুমোতে দাও। তোমাকে কিভাবে আপ্যায়ন করবো? সে বলল। আমি দেয়ালের খুটিতে টাঙানো ভুট্টা দেখলাম। সেঁকা ভুট্টা ... সোনালী মুক্তোর মতো স্বচ্ছ দানা।

দু'জনে আমরা হেসে ফেললাম। সে বলল, 'আমার তো অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে, যা আছে তা দিয়ে কাজ চলে না। 'আমি বললাম, 'আমারও একই অবস্থা। ভুট্টা খেতে পারবো না।' আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে স্বজনেরাও ভেতরে এসে পড়ল। এরপর বাচ্চারা এসে একে অন্যের সাথে খুব তাড়াতাড়ি মিশে গেল আর বন্ধুত্ব।

আমরা দু'জন ধীরে ধীরে বাইরে চলে এলাম। ধীরে ধীরে চলে এলাম পুলের ধারে।

সে বলল, আমি ছ'বছর তোমার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি কথামতো সেই দিন এলে না কেন?

আমি বললাম, আমি এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে এক যুবকের সঙ্গে মাখামাখি করতে দেখে ফিরে চলে গিয়ছিলাম।

- কী বললে?

- হ্যাঁ, তুমি তার সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলে একই থালা থেকে। আর সে তোমার মুখে আর তুমি তার মুখে দলা পাকিয়ে খাবার খাইয়ে দিচ্ছিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদম চুপ করে গেল সে। তারপর জোরে হাসতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হল?

সে বলল, আরে সে তো ছিল আমার সহোদর ভাই। সে হাসতে হাসতে বলল, আমার সাথে সে দেখা করতে এসেছিল যেদিন তোমার আসার কথা ছিল। ও তো ফিরেই যাচ্ছিল। আমি তাকে যেতে দিইনি। তোমার সাথে দেখা হবে বলে। কিন্তু তুমিই তো আসনি।

সে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। ছ'বছর আমি তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমি চলে যাবার পর ভগবান আমার কোলে একটি ছেলে উপহার দিল। তোমারই ছেলে। কিন্তু একবছর পর সে মারা গেল।

আরও চার বছর তোমার পথে চেয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপরও যখন তুমি এলে না, আমি বিয়ে করলাম। দু'টি শিশু বাইরে বেরিয়ে এল। খেলতে খেলতে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে ভুট্টা খাইয়ে দিচ্ছিল। সে বলল, এ আমার নাতি।

আমি বললাম, ওটি আমার নাতনী।

দু'জন ছুটতে ছুটতে ঝিলের ধার পর্যন্ত চলে গেল। জীবনের দু'টি সুন্দর চিত্র যেন ফুটে উঠেছে। আমরা বেশ কিছুক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। সে আমার কাছে এসে বলল, তুমি এসেছ, খুব ভাল লাগছে। আমি তো এখন আমার জীবন তৈরী করেছি। এ জীবনের সকল সুখ-দুঃখ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আর আজ তুমিও এলে। আমার মোটেই খারাপ লাগছে না।

আমি উত্তর দিলাম, আমারও একই অবস্থা। ভেবেছিলাম জীবনেও তোমার সাথে আর দেখা করব না। তাই এ বছর আমি কখনও ভুলেও এদিকে আসিনি। এখন এসে মোটেই খারাপ লাগেনি।

আমরা দু'জনেই নীরব। বাচ্চারা খেলতে খেলতে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। আমি তার নাতিকে জড়িয়ে ধরলাম আর সে আমার নাতিকে। আর আমরা দু'জনে খুব খুশী আর পরস্পরকে দেখছিলাম। তার চোখের মণিতে চাঁদের ঝিলিক, আর ওই চাঁদই বিস্ময়ে ও আনন্দে যেনো বলছিল, মানুষ মরে যায়, কিন্তু জীবনতো মরে না। এক বসন্তে শেষ হলে আবার বসন্ত আসে। ছোটখাটো ভালবাসাও শেষ হয়, কিন্তু জীবনের মহৎ ও যথার্থ প্রেম চিরন্তন থেকে যায়। তোমরা এই বসন্ত দেখলে কিন্তু আগামী বসন্তে তোমরা থাকবে না। কিন্ত জীবন তো থাকবে আর প্রেমও থাকবে। যৌবন থাকবে, সৌন্দর্য আর সারল্য।

বাচ্চারা আমার কোল থেকে নেমে পৃথক পৃথকভাবে খেলতে লাগল। ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে খুবানি গাছের কাছে চলে গেল, যেখানে নৌকা বাঁধা ছিল। আমি জানতে চাই, "এইটা কি সেই গাছ?" সে হেসে উত্তর দিল, "না, এটা কিন্তু সেই গাছ নয় অন্য গাছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# মিস নৈনিতাল

প্রথমদিকে আমার মেজাজ ছিল রোমান্টিক। পাখির কলতান, নীল আকাশ। রংধনুর বিচিত্র রং, গালে টোনপড়া মেয়েদের হাসি আর পাহাড়ী নদীর কলকাকলী আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো। কিন্তু আমার বাবা গোবিন্দরাম একদিন আমাকে ডেকে বললেন, "বাবা শ্রীরাম এই জগত কল্পনার রঙিন ফানুসে চলতে পারেনা। বরং হিসাব করে চলতে হয়। তাই তোমাকে কবি হওয়ার পরিবর্তে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে।"

আমি বেহিসাবী লোক তাই টাকা-আনা-পাই এর হিসাবকে ঘৃণা করতাম। ভাবতাম, দুই-এ দুই-এ চার কেন হয় পাঁচ হয় না কেন? একে একে দুই না হয়ে এক হতে পারেনা? অনেকের জীবনে তাই হয়ে থাকে। যেহেতু আমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে তাই যোগ বিয়োগ ও অঙ্কশাস্ত্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করি।

অবশেষে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার পরীক্ষার রেজাল্ট শুরন সারদা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছে। কারণ তার সাথে বাল্যকালেই আমার বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। সারদা আমার কৈশোরের খেলার সাথী। ছাত্র জীবনেই আমরা দু'জনে কল্পনায় ভবিষ্যতের বাড়িঘর, সন্তানের সংখ্যা কত হবে, সকালে নাস্তা কি খাব সব ঠিক করে রেখেছিলাম।

আমার রেজাল্ট বের হওয়ার পর লালা বিহারীলাল বাবার সাথে দেখা করেন। বিহারীলালের অফিসে বাবা একাউন্ট্যান্ট হিসেবে চাকরি করতেন। তাঁদের আলোচনার পর আমার বিয়ে সারদার পরিবর্তে মধুমতীর সাথে ধার্য হয়ে। মধুমতী বিহারীলালের একমাত্র আদুরের কন্যা। মধুমতী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী নৈনিতাল থাকে। এখন মধুমতীর মন জয় করার জন্য আমাকে নৈনিতাল যেতে হবে। মধুমতীর আপত্তি না থাকলে লালাজী আমাকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করবেন। বাবার প্রস্তাবে আমি আপত্তি জানাই। আমার হিসাবে মিলবেনা। সারদার মুখচ্ছবি আর ডাগর চোখের অশ্রু আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। কারণ লালাজী লক্ষপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ঐশ্বর্য ও ধন সম্পদের জোরে মধুমতীর জন্য কোটিপতির ছেলেকে জামাতা হিসেবে পেতে কষ্ট হবেনা। বাবার স্পষ্ট উত্তর লালাজী কোটিপতির ছেলেকে জামাতা করতে নারাজ। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ধনী পরিবারের ছেলে শ্বশুরের টাকা পিতার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে রাখে। ফলে নানা ঝামেলা ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। লালাজী এই জাতীয় ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে চাননা। তাই তোমাকে আজই মধুমতীর মন জয় করতে হবে। নৈনিতাল যেতে হবে। তোমাকে তেমন বেগ পেতে হবেনা। কারণ লালাজী নিজেই চেষ্টার কম করছেন না। তিনি ইদানীং কনস্ট্রাকশন লাইনে নেমেছেন। জামাতা ইঞ্জিনিয়ার হলে তার অনেক টাকা বেঁচে যাবে। তুমিই ভেবে দেখ কোথা থেকে কত উন্নতি হবে তোমার? বৃদ্ধ পিতার বয়স আর মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দাও। এখনও তোমাকে তিনজন কুমারী বোনকে বিয়ে দিতে এবং চারজন ছোট ভাইকে পড়াশুনার খরচ যোগাতে হবে। হিসেব করে দেখ কত টাকা লাগবে।"

যোগ-বিয়োগের পর আমি নৈনিতাল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার সিদ্ধান্ত জেনে সারদার কি কান্না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "রামজী এটা কি ধরনের হিসাব?" আমি উত্তরে বলেছি, "একে বলে হায়ার ম্যাথমেটিক্স।"

সারদার কমনীয় চেহারা মধুমতীর তুলনায় কিছুই নয়। মধুমতী হীরের টুকরোর ন্যায় সমুজ্জ্বল আবার কঠোরও ছিল। তার ঠোঁট যদি মূল্যবান লালপাথরের সমতুল্য হয় তবে চোখ নীলা পাথর। মুখমন্ডল গোলাপফুল আর দাঁতের পাটি মুক্তার সাথে তুলনা করা যায়। মধুমতী যখন হাসে, মনে হয়, পোখরাজ পাথরের শ্বেতদানা ঝরে পড়ছে। তেমনি একদিন মধুমতী যখন খিলখিল করে হাসছিল, তখন তার চোয়ালের নিচে রুমাল মেলে ধরে আমার পোখরাজ পাথরের দানা কুড়াবার সাধ হয়েছিল। কিন্তু পাছে সে আপত্তি জানায় এবং আমার হিসাবে গরমিল হয় তাই একাজে এগুতে সাহস করিনি।

কলেজ জীবন থেকে মধুমতী আমার পরিচিত। অত্যন্ত বদমেজাজী ও দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে ছিল। সব ব্যাপারে প্রভুত্ব খাটাতে ছিল সিদ্ধহস্ত। লেখাপড়ায় তেমন সুবিধের ছিলনা। কিন্তু প্রতিবছর পরীক্ষায় যথারীতি পাস করতো যেহেতু তার বাবা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। কথায় কথায় অধ্যাপকদের উপহাস করাই ছিল তার অভ্যাস।

কলেজে একজন নতুন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক এসেছে। সে মধুমতী কে তা জানত না। তাই ক্লাসে মধুমতীকে প্রশ্ন করে, 'ইস্পাত কিসে তৈরি হয়?' লোহা থেকে মধুমতীর উত্তর। উত্তপ্ত লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি হয় সত্য, কিভাবে তৈরি হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে।" মধুমতী রুক্ষ ভাষায় উত্তর দেয়।

কারখানায় তৈরি হয় বুঝলাম কিন্তু কিভাবে তৈরি হয়? অধ্যাপকের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

মধুমতী ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয়, প্রফেসর সাহেব, এটা ভারী অন্যায়। কেমিস্ট্রির অধ্যাপক আপনি আর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কেন? এই ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। মধুমতীকে কলেজে দূর থেকে দেখেছি যেমন দূরবীন দিয়ে লোক চাঁদ দেখে। এখন আমি মধুমতীর হাতে হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটছি। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম। আমি মধুমতীর কোমরে হাত রেখেছি আর সারাদেহে কিসের এক শিহরণ অনুভব করছি।

নৈনিতাল রওয়ানা হওয়ার আগে আমি পুরনো বইয়ের স্তূপ থেকে শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাইরন ও লংফেলোর কবিতাগুচ্ছ মুখস্থ করেছি। কেননা প্রেম সম্পর্কিত ইংরেজী কবিতা মুখস্থ রাখা খুবই প্রয়োজন। মধুমতীর পরিবর্তিত স্বভাব ও মেজাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা সংগ্রহ করেছি।

জানিনা আমার এই খাটুনি ও কবিতা সংগ্রহের ফলাফল কি দাঁড়ায়? তবে মধুমতীর গর্ব ও বদমেজাজ সবই উবে গেছে। বার বার সে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাঁধে মাথা রেখেছে। দেয়ালে তার ছায়া দেখে আমার মনে হয়েছে, কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে. সারদার লাজুক লাজুক মুখখানি আর অশ্রুসিক্ত নয়ন যুগল আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছে। কিন্তু আমি তা কাটিয়ে উঠেছি কারণ আমার লক্ষ্য অন্য কিছু।

দীর্ঘদিন একত্রে পায়চারী ও ভ্রমণের পর আমার মনে হয়েছে আমি মধুমতীর মনঃপুত হয়েছি। প্রথমবার সে আমার দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায় যেমন সুন্দরী মেয়েরা হীরের আংটি কিনে কৌতুক ভরে চোখ বুলায়।

মধুমতী পরদিন আমার সাথে চীনা শৃঙ্গের আরোহণের প্রতিশ্রুতি দিল এবং ঘোড়া ও রিক্সার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল। আমার হাতে টিপ দিয়ে বলল, আমি পদব্রজেই যাব। পাছে প্রয়োজন হয় তাই এই ব্যবস্থা। অর্থই যদি পৃথিবীতে সবকিছু হয়ে থাকে, তবে আমার এ চিঠি পেয়ে বাবা ভীষণ খুশী হবেন। আমি সে রাতেই বাবার কাছে তিন অক্ষরে চিঠি দিলাম, Q.E.I.I পরদিন ভোরে বাংলোতে এসে দেখি, মধুমতী বিষন্ন। বলল, "চীনা শৃঙ্গে যাওয়া হবে না। তুমিও যেতে পারবে না।" কেন? আমি জানতে চাই।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে জানা গেল, পাহাড়ের ঢালু থেকে পড়ে মধুমতীর এ্যালশেশীয়ান কুকুরটি গুরুতররূপে আহত হয়েছে এবং পেছনের পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

"তুমি ডান্ডিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাও।" "নৈনিতালে পশু হাসপাতাল কোথায় জানিনা।" আমার স্পষ্ট উত্তর।

"পশু হাসপাতাল নয় ; মানুষ চিকিৎসার হাসপাতালে নিয়ে যাও।"

"যদি ডাক্তার চিকিৎসা করতে না চায় তাহলে?" "তা কেন? হাসপাতালটি আমার বাবাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি ডাক্তারকে ফোন করে দিচ্ছি।"

ডান্ডিতে চড়ে কুকুরটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। রোগীর ভীড় করিডোরে। দরজা খুলেনি। আর্দালীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বড় সাহেব কোথায়?"

"ভেতরেই আছেন।"

"তাকে সংবাদ দাও, মধুমতী মেম সাহেবার কুকুর এনেছি।" আর্দালী ভেতরে গিয়ে আর ফিরছেনা। আমি হাসপাতালের বারান্দায় অধীর হয়ে পায়চারি করছি। দু'জন বৃদ্ধ ঘুংড়ি কাশিতে আক্রান্ত। ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছে। পুষ্টির অভাবে একটি শীর্ণকায় শিশু মায়ের কোলে অবিরাম কাঁদছে। গায়ের রং মেটে হয়ে গেছে। মনে হয়, জন্মের পর থেকে শিশুটির ভাগ্যে পুষ্টিকর খাবার জোটেনি। বারান্দায় এক কোনায় বেঞ্চির উপর একটি যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে আছে। দেহে বাঘের কামড়ের দাগ। আর রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সারাদেহ নীল হয়ে গেছে। তার বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রী উৎকণ্ঠার মাঝে একে একে সকলে আর্দালীর কাছে ডাক্তারকে খবর দেয়ার জন্য হাতজোড় করে মিনতি জানিয়েছে।

হঠাৎ বড় ডাক্তার সাহেব পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে। আর্দালী আমার দিকে ইশারা করে, ডাক্তার জানতে চায় সমুন্দর কোথায়?

আমি উত্তর দিলাম, সমুদ্র বোম্বেতে। পরে জানতে পারি মধুমতীর কুকুরের নাম সমুন্দর। তখন আমি লজ্জিত হয়েছি। ডাক্তারকে জানাই সমুন্দর ডান্ডিতে পড়ে আছে। দু'জন আর্দালী স্ট্রেচার নিয়ে দৌড়ায়। সমুন্দরকে স্ট্রেচারে এনে ডাক্তারের সামনে রাখা হয়। এদিকে বাঘের কামড়ে আহত যুবকের পিতা করজোরে অনুরোধ জানায়, ডাক্তার আমার ছেলেকে বাঁচান। একে বাঘে কামাড়িয়েছে।" ডাক্তার, বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্ট্রেচারে রাখা কুকুরের উদ্দেশ্যে বলল, হ্যালো সমুন্দর। ইউ হ্যাভবিন হার্ট। হোয়াট এ শেম। বাট ডোন্ট ওরি ইউ উইল বি সেট রাইট ইন এ মিনিট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কুকুর কি দেশী ভাষা বুঝেনা?"

"শুধু ইংরেজী ভাষা বোঝে।" ডাক্তার আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন দু'পাওয়ালা আমি কোন জাতের কুকুর তা যাচাই করে দেখছে।

কুকুরের স্ট্রেচার নিয়ে ডাক্তার যখন অপারেশন কামরার দিকে এগুচ্ছিল, তখন বাঘের কামড়ে আহত যুবকের বৃদ্ধপিতা ডাক্তারের পা ছুয়ে অনুরোধ জানায়, "একে একটিবার দেখে যান ডাক্তার সাব।"

"এখনি আসছি, এখনি আসছি।" বলে ডাক্তার অপারেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। সমুন্দরের পায়ের হাড় প্লাস্টারে জোড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ভয় নাই। ডাক্তার আমাকে অভয় দিল। আর্দালীদ্বয় কুকুরটিকে স্ট্রেচারে করে ডান্ডিতে তুলে দেয়। আমি ডাক্তারের পিছু পিছু বাঘের কামড়ে আহত যুবকটিকে দেখতে যাই। ডাক্তার তার নাড়ী পরীক্ষা করে দেখছে। বৃদ্ধ পিতার কাতর ধ্বনি, "ডাক্তার একে যেভাবে হোক বাঁচান।" কিন্তু এ যে মারা গেছে। ডাক্তার ধীর কণ্ঠে বলল।

যতদিন বেঁচে থাকবো এই বৃদ্ধের মুখচ্ছবি আমি ভুলতে পারবোনা। সে একবার ডাক্তারের দিকে আবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তার ভীত শঙ্কিত দু'চোখে অশ্রুভরে এসেছে কিন্তু একে বাধা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কপালে বার্ধক্যের রেখা। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে এবং ঠোট দু'টি সাইক্লোনে কম্পমান গাছের পাতার ন্যায় কাঁপতে থাকে। প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করে বৃদ্ধ কোন কথা বলতে পারেনি। অবশেষে বিস্ফোরিত চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে আর চীৎকার করে উঠে। "কিন্তু সে তো একটু আগেও বেঁচে ছিল।" ডাক্তার মাথা নত করে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজ কামরায় চলে যায়।

বাংলাতো ফিরে আসার সময় আমি ডান্ডি ও ঘোড়া দুটোই বিদায় দিয়েছি কারণ দু'জন আর্দালী কুকুরটিকে বয়ে আনছিল। আমি নীরব, মুখে রা নেই। মধুমতী আর্দালী দু'জনকে ২০ টাকা বখশিশ দিয়ে বিদায় দেয় আর আমাকে গালে গাল ঘষে পুরস্কৃত করে। অতঃপর মধুমতী সমুন্দরের পরিচর্যায় ব্যস্ত। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমাকে উদাসীন দেখে মধুমতী বলল, "তুমি এরকম চুপ হয়ে গেলে কেন? আমার সমুন্দর বেঁচে যাওয়াতে বুঝি তুমি খুশী নও?"

"তা নয়। অতঃপর আমি হাসপাতালের ঘটনা আগাগোড়া তাকে শোনালাম।

জংলী লোকেরা দৈনিক বাঘের আক্রমণে আহত হয় আর কত লোক মারা যায় তার হিসাব নেই। তাছাড়া দৈনিক প্রতি মিনিটে বিশ্বে হাজারো লাখো লোক মরছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্যার হিসাব করলে কাজই করতে পারবেনা শ্রীরাম। চলো বারান্দায় শীতল বাতাসে বসে চা পান করি। একথা বলে মধুমতী আমার হাত ধরে টেনে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। আমাকে কীটস-এর কবিতা আবৃত্তি করতে বলে কারণ কীটসের কবিতা তার কুকুরের দেহের লোমের ন্যায় কোমল ও মোলায়েম।

অনেক চেষ্টার পরও সে আমার মেজাজ পরিবর্তন করতে পারেনি। আমি চুপচাপ উদাস হয়ে বসেছিলাম। আমার বাক শক্তি, হাসি ও চিন্তাশক্তি যেন রহিত হয়ে গেছে।

চা এসে হাজির। চা তৈরি করে আমার দিকে বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলে, "নাও, চা পান করো।"আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে সে জোর করে আমার মুখে বিস্কুট পুরে দেয় আর জোর দিয়ে বলে, "তোমাকে খেতেই হবে। খাও।" আমি বিস্কুট খাচ্ছি নীরবে চিবিয়ে খাচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো আমি নিমকি বিস্কুট খাচ্ছি না মানুষের কাঁচা মাংস খাচ্ছি। আমার বমি আসার উপক্রম হয় আর আমি সেখান থেকে উঠে ছুটে পালালাম। মধুমতী বার বার আমাকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছিল কিন্তু আমি পেছনে ফিরে তাকাইনি।

আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ আমি সারদাকে বিয়ে করিনি বরং মধুমতীকে বিয়ে করেছি। তখন আমার বয়স ছিল কম, হিসাবী ছিলাম না, যোগ-বিয়োগ মাথায় ঢুকতো না। এখন আমি জীবনে একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। একটি বিরাট কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর মালিক। ইদানিং কত লোক নানা স্থানে মারা যাওয়ার সংবাদ পাচ্ছি। কিন্তু আমার চায়ের বিস্কুটের স্বাদে কোনদিন তারতম্য হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পুল

সে পুল পথ দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় এক বর্ষীয়সী মহিলা এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর সাথে আলাপ করছিল। রোজ সন্ধ্যায় পায়চারী করতে গিয়ে রাস্তার একই জায়গায় এই দুই মহিলার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। অধিকাংশ সময় সে চোখ তুলে দীর্ঘদেহী মহিলার দিকে চেয়ে থাকে। মহিলা তার এক নজর চাহনি থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার সিথিকাটা কেশরাজি আজানুলম্বিত ওভারকোটের পিঠে খোপা দেখা যায়। মাঝে মাঝে খোঁপায় ফুল গোজা থাকে। খোঁপার ফুল পরলে তাকে বেশ সুন্দর দেখায়।

তার সলাজ দৃষ্টির চাহনি আর গোলাপী চেহারা তাকে সর্বদা আকৃষ্ট করত। কিন্তু দীর্ঘদেহী মহিলার মুখে হাসি নেই। তার চোখে-মুখে অবশ্য কিছুটা হাসির আভা দেখা দিলেও সে ঠোঁটে লিপিস্টিক ব্যবহার করত। তাই তার কোমল ঠোঁটে সর্বদা এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বল্য দেখা দিত। কাছে থেকে তাকে রঙিন পুতুল মনে হতো, যখন সে একা বের হত। অবশ্য দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে সে তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত। কিন্তু দীর্ঘদেহী তরুণীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দৃষ্টি আনত করা ছাড়া সে তার চাহনির উত্তর পেত না।

আজ তার ঠোঁটের লিপিস্টিক আলোতালো আর রং গাঢ় লাল, ডান গালেও একটি দাগ দেখা যাচ্ছে। পাতলা কোমরের চলার গতিও কিছুটা স্তিমিত, পা দুঁটি যেন চলছেনা। সে ভাবে হয়তো মহিলা অসুস্থ কোন কঠিন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত, তদুপরি সঙ্গে কোন পুরুষও নেই। হাসি খুশী উৎফুল্ল দম্পতির দল পেছনে ফেলে এসেছে। সড়কের এই জায়গাটুকু অত্যন্ত নির্জন। পাইন গাছের সারি সড়কের দু'পাশে ছায়া মেলে একা দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের আর একদিকে লাল ঝান্ডা উড়ছে। সড়কের এই অংশটুকু নতুন নির্মিত। লাল পতাকা বিপদের সংকেত। কোন একটি মারাত্মক যৌনব্যাধি প্রভৃতি তার মনে নানা প্রশ্ন তোলপাড় করছিল। সে ভাবছে তার ধারণা সঠিক। কারণ মেয়েটির বিষন্নতা, বৃদ্ধা মহিলার বাঁকা চোখের ভ্রু, পায়ের ধীরগতি মাথা নত করার মত অসুবিধা নিশ্চয় রোগের লক্ষণ। আবার তার মনে হয় নিশ্চয় কোন ভদ্র ঘরের মহিলা। ভদ্র ও ধনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ভাবে, সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী দুটোই অসভ্যের নমুনা। একটি বাদামী রং-এর ঘোড়া তার পাশ দিয়ে চলে যায়। একজন শ্বেতাঙ্গ ঘোড়ার সওয়ার ছিল। পরনে তার খাকি শার্ট আর গলায় লাল রং একটি দাগ মনে হচ্ছিল। এরা খাওয়া-দাওয়া আর প্রচুর পানাহারে পটু। অথচ তার পকেটে মাত্র একটি টাকা আছে। রোজ সে মনি অর্ডারের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু মনি অর্ডার এখনও এসে পৌঁছেনি।

আকস্মিকভাবে তার মনে দুনিয়ার তাবৎ গরীবদের জন্য করুণার সঞ্চার হয়। তাই শ্বেতাঙ্গ, ভদ্র মহিলার বাঁকা চোখের ভ্রুর প্রতি তার ঘৃণার সঞ্চার হয়। এরা ডাকাত.....ছোট লোক.....পার্থিব সম্পদ। সেই বাদামী রং এর ঘোড়া.....হয়তো ইংরেজ সাহেবের নয় বরং কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। পরের ধনে পোদ্দারী করছে অথচ দেখাচ্ছে নিজেরই সম্পত্তি। আবার পকেটে হাত দিয়ে একটি টাকা বের করে দেখে নেয়....তারই নিজস্ব সম্পত্তি আর শেষ সম্বল।

সূর্য অস্ত গেছে তাই চারদিকে গোধূলির অন্ধকার নেমে আসছিল। সড়কের সামনের মোড়ে নদী কুলুকুলু বয়ে যাচ্ছে।

পানির সফেদ স্রোত আর গোধূলির আবির রং মিলে এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। আর পানি কুলুকুলু রবে কাঠের পুলের তল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। সে সড়কের ঢালু পথ অতিক্রম করে পুলে গিয়ে হাজির হয়। পুলের কাছে এক নেড়া মাথা কাশ্মীরী বুড়ো, যার কানের গোড়ায় চুলে পাক ধরেছে ঝুড়িতে পেয়ারা নিয়ে বসেছিল। তাকে দেখেই বুড়ো ছালাম করে। পেয়ারা পাকা ছিল। সে এক আনার পেয়ারা কিনে একটি মুখে পুরে আর বাকী কয়টি পকেটে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য দেখতে থাকে।

পুলের নিচে প্রবাহমান পানির দিকে সে তাকিয়েছিল। তার মনে হল পুলটি উড়ন্ত খেলনা আর সেই উড়ন্ত কাঠের খেলনায় বসে শূন্যে ভেসে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করছে। বুড়ো ফল বিক্রেতাকে তার কাছে তুচ্ছ বোকা বলে মনে হল। বেচারী বুড়ো সকাল থেকে এই পুলের পাশে বসেছিল পেয়ারার ঝুড়ি নিয়ে। নিশ্চয় বুড়ো এই শূন্যে উড়ে বেড়ানোর আনন্দ ভোগ করেনি জীবনে। বুড়ো খুব গরীব ছিল। ..... সে আজ এক আনা আয় করেছে। সকাল থেকে সে পুলের কাছে পেয়ারা বিক্রির জন্য বসেছিল। বুড়োর ধৈর্য্য দেখে আশ্চর্য লাগে। সকাল থেকে বসে আছে আর এখন মাত্র এক আনার পেয়ারা বিক্রি করেছে।

এখন তার নিজের পকেটে মাত্র পনের আনা আছে। সম্ভবত আগামীকাল মনি অর্ডার এসে পৌঁছবে। শূন্যে কল্পনায় ঘুরে বেড়াতে তার বেশ মজা লাগে। সে এক উড়ন্ত পুলের উপর বসেছিল। সে শূন্যে উড়ছে অথচ কেউ তার দিকে বিস্মিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেত্রে তাকাচ্ছে না। কয়েকজন বখাটে ছেলে একটি ঘোড়ায় চড়ে সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তারা তাকে দেখতে পায়নি। বোকা ছেলের দল। ঘোড়ায় চড়ে জোড় কদমে এগিয়ে যাচ্ছে, কোন দিকে তাকাচ্ছে না। ঘোড়ায় চড়ার ভাড়া প্রতি ঘন্টা দু'আনা, ঘোড়া হাকাও আর সেই বুড়োকে আর ঘোড়ার মালিককেও ঘামে ভিজে একাকার বুড়ো হেঁটে যাচ্ছে – এদিকে ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। সেভাবে মানুষ আর ঘোড়ার মধ্য পার্থক্য কি? আর যদি পার্থক্য থাকে তাহলে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না কেন? কিন্তু তার মনের দুষ্ট বিবেক বলে, কি ভাবছ আজেবাজে পেয়ারা খাও আর এই উড়ন্ত সোনালী পুলে সওয়ার হয়ে উড়ে বেড়াও।" সত্যিই ভাল বুদ্ধিতো, সে আবার পকেট থেকে আর একটি পেয়ারা বের করে খেতে থাকে। পুলের অপর দিক থেকে একজন ফিটফাট বাবুকে আসতে দেখা গেল। কিন্তু লোকটি তার দিকে ফিরেও তাকায়নি কারণ সে মাথা নিচু করে হেঁটে আসছিল। আর হাতে একটি আয়না। মুখে দাঁড়ি। লোকটি তার পাশে এসে দাঁড়ায় সে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার নাম কি?"

বুড়ো উত্তর দেয় "অধ্যাপক রবার্ট ফোর্ড। আমি বৃটিশ সোসাইটি অব সায়েন্সের সভাপতি।

সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সত্যিই আনন্দিত হয়েছি।" অতঃপর পকেট থেকে একটি পেয়ারা বের করে লোকটির হাতে দিয়ে সে বলল, "খান।" বুড়ো প্রফেসর আয়নায় পেয়ারাটি পরীক্ষা করে দেখে আবার তাকে ফেরত দিয়ে দেয়, "আমি পেয়ারা খাই না। আমি বৃটিশ রয়েল সোসাইটি অব সায়েন্সের সভাপতি।

"বেশ ভাল ভাল কথা, বলুনতো আকাশ ভ্রমণে কেমন মজা লাগছে। এই সোনালী পুলটি দেখুন কি দ্রুত পানি উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। একটি সামুদ্রিক জাহাজ ..... ।"

বুড়ো প্রফেসর স্মিত হাস্যে তার দিকে তাকায় আর আয়নার ভেতর দিয়ে নদীর স্রোতধারা অবলোকন করে।

প্রফেসর ফোর্ড বলল, "তুমি একজন আনাড়ী। পুল আকাশে উড়ছে না বরং নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু পানি দ্রুত বয়ে যাচ্ছে পুলের নিচ দিয়ে। একে বিজ্ঞানীরা "দৃষ্টির ধাঁধা" বলে থাকে।

"মিথ্যা কথা" সে জোর গলায় বলে।

"অবশ্যই মিথ্যা কথা।" আর একজন দীর্ঘদেহী ফর্সা লোক তার পাশে এসে দাঁড়ায়। গেরুয়া রং এর ধুতি লোকটির পরনে আর বুক খোলা। মাথায় সোনালী চুলের জটা আর চোখ দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল। লোকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, "প্রফেসর ফোর্ড যা বলছে সব মিথ্যা এই পেয়ারা বিক্রেতা তীব্র গতিতে প্রবাহিত নদীর পানি, সোনালী পুল, এই দুনিয়া সব মিথ্যা।"

সে পেয়ারা খেতে খেতে বলে, "এ আমি ভাল করেই জানি যে, পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গদের রাজত্ব চলছে। তাই এই পৃথিবীটা সম্পূর্ণ "সাদা" মিথ্যে কথায় ভরপুর। কিন্তু.....।"

প্রফেসর ফোর্ড কথার জের টেনে বলল, "তুমি কে?" ফর্সা দীর্ঘাদেহী লোকটি হেসে উত্তর দেয়, "আমি গৌতমবুদ্ধ, ভারতের সবচেয়ে সেরা লোক।"

সে বলল, "আপনার দেখা পেয়ে সত্যিই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। নিন একটি পেয়ারা খান। খুব মিষ্টি। পুলের কাছে গরীব লোকটি বিক্রি করছিল তার কাছ থেকে কিনেছি।"

গৌতম বুদ্ধ হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "না না আমি পেয়ারা খাই না। এই পেয়ারা হচ্ছে মায়া। আমি সব মায়া চিরতরে ত্যাগ করেছি। আর তোমরা যদি নির্বাণ চাও তাহলে.....।"

সে বলল, "সত্যিই ভুল হয়ে গেছে।" তারপর তার চোখে সামনে ভেসে উঠে, গভীর রাতে এই ফর্সা লোকটি তো রাজত্ব, সম্পদ, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র ত্যাগ করে নির্বাণের সন্ধানে চলে এসেছিল।

সে ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার স্ত্রী কোথায়?" গৌতম রেগে পাল্টা প্রশ্ন করে, "তুমি কি প্রশ্নটি কিভাবে চিন্তা করেছ?"

ফোর্ড বলে, "আমি বলতে চাচ্ছি যে, তুমি কি ছাই এখানে বেড়াতে আস। দেখো, রাস্তায় সুন্দর দম্পতিরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে হাসি। তরুণ-তরুণী; বুড়োবুড়ি সকলে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হয়....এখানে যাদের স্ত্রী আছে তারাই জোড়া জোড়া বেড়াতে আসে। যাদের বউ নেই অথবা মারাত্মক স্ত্রীরোগে আক্রান্ত তারা.....তার চোখের সামনে একটি বিষন্ন চেহারা ভেসে ওঠে ঠোঁটে লিপিস্টিক, খোঁপায় ফুলের তোড়া, পাতলা কোমর আর একটি বৃত্তের মাঝে যেন সব কিছু ঘুরছে।

গৌতম কাঁধ নেড়ে বললেন, "আমি যশোদাকে ত্যাগ করেছি কারণ মেয়েদের ভালবাসাও মায়া। এসব পৃথিবীর মায়াজাল আর যশোদা ছিল তারই একটি বিন্দুমাত্র।"

প্রফেসর ফোর্ড অধৈর্য হয়ে বললেন, "তুমি একটি বিন্দুকে কি মনে কর.....। বাহ্যত তুমি হয়তো একটি বিন্দুকে বিশেষ আমল দিচ্ছ না। একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে একটি বিন্দুতে সীমাহীন বিন্দু নিহিত আছে। তুমি এমনিতে বুঝবে না। আমি তোমাকে এই আয়না দিয়ে বুঝিয়ে দিব। যখন একটি বিন্দুতে সূর্য কিরণ পতিত হয় তখন কিভাবে সেই বিন্দু আগুনের পিন্ডে পরিণত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌতম বুদ্ধ উত্তর দেয়, "সব মিথ্যা নির্বাণের পথ সম্পূর্ণ আলাদা আর তোমরা.....।"

এদিকে পুলের কাছে বসে থাকা পেয়ারা বিক্রেতা বুড়ো চিৎকার করছিল। সে পিছন ফিরে দেখে বুড়োর পাশে পৌরসভার দু'জন কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দু'জনে বুড়োকে গালাগালি করছে। একজন বলছে, " তোমার লাইসেন্স কোথায় ? তুমি এখানে লাইসেন্স ছাড়া কেন পৌরসভার সীমানার ভেতর পেয়ারা বিক্রি করছ?" অপরজন বুড়োকে আঘাতহানে বলল, "হারামজাদা..... ন্যাড়া লাইসেন্স ছাড়া ফল বিক্রি করছ। এটা কি তোমার বাবার জমিদারী।"

পেয়ারা বিক্রেতা বেচারী বুড়ো চিৎকার করে বলছে "হে ভগবান, আমাকে ক্ষমা করো। বাবা আমি জানিনা। আমি গরীব মানুষ। আমি কখনও এ অন্যায় কাজ করব না। পুলের কাছে কখনও বসবনা। ভগবানের দোহাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

একজন বুড়োকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "হারামী, কুত্তা, শূয়োরের বাচ্চা, ওঠ এখন কি দেখছ ? ঝুড়ি ওঠাও, চলো ইনস্পেক্টরের কাছে।" অপর লোকটি রেগে টং। সে বুড়োর ঝুড়ি উপুড় করে ফেলে দেয় আর সব পেয়ারা নদীর স্রোতে টপটপ করে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

সে গৌতম ও প্রফেসর ফোর্ডের কাঁধে নাড়া দিয়ে বলল, "ঐ দেখুন, ঐ দেখুন। এ গরীব বুড়োর উপর কিরূপ নির্যাতন চলছে।"

হে খোদা, এই পৃথিবীতে গরীব মানুষকে বসবাসের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তোমরা দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছ। চলো এই গরীব বুড়োকে রক্ষা করি..... এসো।"

কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করে, কাঠের পুলের উপর সে একা দাঁড়িয়ে. সন্ধ্যার গোধূলি অন্ধকার দু'জন লোক বুড়োকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর সে এই দৃশ্য দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# বিচারক

দুই বন্ধু যদি আই. সি. এস অফিসার হয়, তাহলে ভারসাম্য বজায় রাখা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু সুন্দরী রণভা বিচক্ষণতার সাথে দুই প্রেমিকের মধ্য ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কারণ রণভা সুন্দরী, তার কমনীয় চেহারা দেখলে বিদেশী আর্ট ম্যাগাজিনের কভার মনে হয়। তার দেহের চামড়া নাইলনের কাপড়ের ন্যায় মোলায়েম ও দাগবিহীন আর তার উদ্ভিন্ন যৌবন ভরা দেহখানি নতুন মডেলের গাড়ির মতো যেন স্প্রিংযুক্ত। অন্যান্য মেয়েদের দেখলে মনে হয়, তাদের মাতাপিতার অনভিজ্ঞ হাতে লালন-পালন করেছে; কিন্তু রণভা যেন আধুনিক কারখানায় নিপুণভাবে তৈরি মডেল। তার দেহের প্রতিটি ভাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নিখুঁতভাবে কারিগর যথাস্থানে সেট করে দিয়েছে। তাই মন চায় রণভাকে জিজ্ঞেস করতে, কোন্ কারখানায় তার দেহ তৈরি সেখানে আরও দশহাজার তারই মত নিখুঁত স্বাস্থ্য ও দেহের অধিকারি মেয়ে সরবরাহের অর্ডার দেয়া যায় কিনা?

যমুনা রণভার ন্যায় সুন্দরী নয়। কিন্তু এমনভাবে হেলেদুলে হাঁটতো যেন হ্রদের পানির বুকে ছোট ছোট ঢেউ পরস্পর কোলাকুলি করছে আর দেহের প্রতিটা ভাঁজ এমন এক ভঙ্গিমার সৃষ্টি করতে থাকে, একমাত্র বেহালার ছন্দোময় সঙ্গীতের সাথে তুলনা করা চলে। পাহাড়ের চূড়ায় এপ্রোমাল রোডে যখন সে ভোরে পায়চারি করতে বের হতো, তখন লোকজন তার সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠা দেহের নিখুঁত স্বাস্থ্য ও লাবণ্য দেখে মোহিত হয়ে পড়তো।

তন্বী জোবেদার কণ্ঠ ছিল সুমধুর, তাকে দেখলে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের কথা মনে পড়ে, হাসি তার মুখে লেগেই থাকতো। তার শ্যামলা কমনীয় চেহারায় শুভ্র দাঁতগুলো হাসলে অপূর্ব লাগত। সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লে মনে হতো, যেন শ্যাম্পেনের দু'টি গ্লাস একটা অন্যটার সাথে টোকা লেগেছে। তাই অনেকেই এই ধরনের মহিলার সান্নিধ্য লাভের ফলে ক্লাবে মাদকরস গলাধঃকরণ না করেই নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মৃণালিনীর চোখ ছিল উদাস আর ঠোঁট ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তার দৃষ্টি হালকা রং এর গালিচার ন্যায় মনোরম। তাকে দেখলে মনে হয়, জীবনের একই একঘেয়ে কষ্টকময় পথে গাছের ছায়ার ন্যায় তার কাজল কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের ভ্রুর ছায়ায় বিশ্রাম নিলে মন্দ হত না। মৃণালিনীকে দেখে দার্জিলিং এর চায়না বিশ্রাম নিলে মন্দ হত না, মৃণালিনীকে দেখে দার্জিলিং এর চায়না শৃঙ্গে যেতে পথে ফুটপাথের পাশের রেস্তোরাঁর কথা স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। এই সব রেস্তোরাঁর নিস্তব্ধ নিঝুম বারান্দায় আবছা আলোতে দন্ডায়মান বেয়ারা আর সতেজ লাইমজুইস সবকিছু মিলিয়ে কি অপূর্ব রোমান্টিক পরিবেশ। এইসব চীনা রেস্তোরাঁয় বসে অধিকাংশ সময় মৃণালিনীর কথা মনে পড়ে। কারণ মৃণালিনীর সৌন্দর্যের কমনীয়তাই ছিল ভিন্নধর্মী।

"রোজ" গোলাপের ন্যায় সুন্দরী ছিল না কিন্তু ময়ূরীর ন্যায় অবশ্যই ছিল। তার নৃত্যের তালে তালে অনেকের হৃদয়ে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি করত। রক এন রোল থেকে আধুনিক ক্লাসিক্যাল কিন্তু প্রেমিক ছিল মাত্র একজন। সেই প্রেমিকের জন্য সে আজ দু'বছর যাবত অপক্ষোয় আছে। কারণ রোজ প্রেমিককে বিয়ে করতে চায়। বিয়ের জন্য ধৈর্য ধরা প্রয়োজন। এ্যানে পেড্রোজার জন্য প্রতীক্ষা করছে সে। কিন্তু দুভার্গ্যজনক ব্যাপার হল, পেড্রোজা তার জন্য অপেক্ষার তোয়াক্কা করেনি কারণ সে একজন আই. সি. এস অফিসার। রণভার ন্যায় অপূর্ব সুন্দরী মেয়েও তাকে লিফট দিতে গৌরববোধ করত। কিন্তু রোজ তার তুলনায় রণভাকে অধিকতর সুন্দরী মনে করে না । রোজের দেহের গড়ন ১২/১৩ বছরের কিশোরীর ন্যায় পাতলা ও লিকলিকে, তার সুমধুর কণ্ঠ আর ববকাটা চুল খুব সুন্দর মানাত। তার ববকাটা চুল দেখলে অর্কেস্টার কথা মনে পড়বে। তার দেহের গড়ন জেট বিমানের ন্যায় নাজুক খুচরা যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি। রণভার কি সাধ্য পেড্রোজাকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়।

ইলা ইতিপূর্বে ছিলেন মিসেস কিলাচান্দ, এখন নিঃসঙ্গ। স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে নিয়েছেন। এখনও তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের ইশারা। তিনি নেপালী। স্বাস্থ্যটাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন অতি যত্নে। আর্য আর চীনা বিউটি তার দেহে একাকার হয়ে গেছে।

আবার হিল স্টেশনে চীফ কমিশনার সাহেবের তিন কন্যা রয়েছে। কমিশনার সাহেব এদের যোগ্য বরের সন্ধানে আছেন। এদের নাম হল যথাক্রমে সুধা, মাধুরী আর আশা। তিনজনের মধ্য আশা ছিল কুশ্রী। অবশ্য মাধুরী ও সুধাও তেমন কমনীয় ছিল না। হাজার হোক কমিশনার সাহেবের মেয়ে, তাই ওদেরকেও সুন্দরী হিসাবে গণ্য করা যায়। কারণ ইদানীং মন্ত্রীদের বক্তৃতাকেও সাহিত্য মর্যাদা দেয়া হয়। তাছাড়া সীতা মেলহোত্রা, ব্রজেস, আবদুর রহমান, বলসিয়ার কাউর, খুরশীদ গোরদালা আর মনজর আনন্দের মেয়ে গৌরীও হিল স্টেশনের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা ছিল স্টেশনের সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। সেদিন ক্লাবের লনে বহু লোকের সমাগম হয়েছে। রং বেরং এর পতাকা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লতাপাতা দিয়ে লনকে সাজানো হয়েছে চোখ ঝলসানো দামী শাড়ি পরিহিতা মহিলা ও শিশুর ভিড়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী তরুণীদের ভয়মিশ্রিত হাসি আর প্রেমিক ও মাতাপিতার সাহস প্রদান, শেষ মুহূর্তে ব্লাউজ পরিবর্তন আর শাড়ির ভাজ দুরস্তকরণ। বাপরে, সুন্দরী প্রতিযোগিতা নয় যেন, আই. সি. এস পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব চলছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকারিণী তরুণীর গৌরবও কম নয়। প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতায় ডজনের অধিক মেয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে আর অভিভাবক ও মাতাপিতা সানন্দে এতে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকেন।

সেদিন ছিল সুন্দরী প্রতিযোগিতার ফাইনাল। রোহিলাখন্ডের সাবেক চীফ কমিশার কুমার বান্ডা সিং আর বিশিষ্ট কবি সীতারাম হলেন সুন্দরী বাছাই এর বিচারক। বিচারের পাল্লা যাতে কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে এবং নিরপেক্ষ বিচার হয়। তজ্জন্য সাবেক বিচারপতি দেশপান্ডেকে বিচারক মন্ডলীর চেয়ারম্যান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া জনাব সৈয়দ এমতিয়াজ হোসেন বার-এট-লকেও কমিটির সদস্য করা হয়েছে। কথিত আছে, ব্যারিস্টার সাহেব রোজ নাকি স্ত্রীকে মারধর করেন। বিচারক মন্ডলীর পঞ্চম সদস্য হলেন কুমায়ুনের বিশিষ্ট ধনী দেওয়ান বলরাজ শাহ্। ভদ্রলোক আবার উল্টো দৈনিক স্ত্রীর কাছে পিটুনী খেতেন। কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য নেয়া হয়নি। কারণ মেয়েরা নিজের চেয়ে অন্য কাউকে অধিক সুন্দরী মনে করে না। তাই অনেক চিন্তা ভাবনার পর কোন মহিলা বিচারককে কমিটিতে নেয়া হয়নি।

সুন্দরী প্রতিযোগিতার বাছাই কমিটিতে মোট পাঁচ জন সদস্যই থাকলো। যারা শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের গুণাগুণ বিচার করে ফলাফল ঘোষণা করবেন। সর্বপ্রথম ঘোষক ক্লাবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনবার ঘন্টা বাজান। ঘন্টাধ্বনি শুনে ক্লাবের বিভিন্ন কামরা থেকে লোকজন বেরিয়ে লনে সমবেত হন। প্রথম সারিতে সোফায় পাঁচ জন বিচারক বসেছেন। তারপর ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্যগণ, তৃতীয় সারিতে শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, তারপর সাধারণ দর্শক উপবিষ্ট। পেছনের সারিতে সমবেত লোকজনের হৈ চৈ। ঘোষক জোরে ঘন্টা বাজিয়ে সকলকে চুপ করতে অনুরোধ জানান।

বিচারপতি দেশপান্ডে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নাম ঘোষণা করেন। অতঃপর ব্যান্ডের বাজনা শুরু হয়। ব্যান্ডের বাজনার তালে তালে দর্শকদের দৃষ্টি ক্লাবের সিঁড়িতে গিয়ে পড়ে। ক্লাবের কক্ষে প্রসাধনরত সুন্দরীরা একে একে বের হয়ে বিচারকমন্ডলীর সামনে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সিঁড়ি থেকে নিচে লন পর্যন্ত লালরঙের গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এই গালিচার উপর সুন্দরীরা নিজেদের রূপ যৌবনের মহড়া দেখাবেন। অনেক দর্শক দূরবীন বের করে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বপ্রথম ইলা গাঢ় রংয়ের শাড়ি পরে কোমর দুলিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে নামে। ইলার ব্যবহৃত সেন্টের সৌরভে পুরা অঙ্গন মুখরিত আর তার মুখে বিজয়সুলভ হাসি। বিচারকদের সামনে ইলা নানা ভঙ্গিমায় তার দেহ সৌন্দর্যের কলাকৌশল প্রদর্শন করে। কোমল হাত বাড়িয়ে শাড়ির আঁচল সামলিয়ে নিয়ে এক ঝটকায় বিচিত্র ভঙ্গীতে মোড় ঘুরলে দর্শকদের প্রাণে দোলা দিয়ে যায়।

এরপর মোগল রাজকুমারীর বেশে দর্শক সমীপে হাজির হয় লাস্যময়ী জোবায়দা। পরনে গাঢ় জামরং এর গারারা আর গায়ে হালকা হলুদ রং এর ফুলের লক্ষ্ণৌ স্টাইলের কামিজ। মাথায় চুমকি লাগানো উড়না। মদের পানপাত্রের ন্যায় চিকন তার গলা, ইচ্ছে হয় পানপাত্র থেকে ঢেলে সব মদ এক নিশ্বাসে পান করে নিই। গলায় পাথরখচিত জরীর গলাবন্ধ তার কমনীয়তা আরও বৃদ্ধি করেছে। ভিন্নতর স্টাইলে কোমর দুলিয়ে জোবায়দা বিচারকদের সামনে এসে হাজির হল। মুখে তার স্মিতহাসি আর এই হাসির ফাঁকে তার শুভ্র সমুজ্জল দাঁতগুলো মুক্তোর ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করছিল। সুন্দরী রোজ গায় সবুজ রং এর সেমিজ আর আঁটসাঁট ব্লাউজ পরে দর্শকদের সামনে এসে হাজির। ব্লাউজের কাপড় ঠেলে তার উদভিন্ন যৌবন যেন ফেটে পড়ছিল। তার চিকন কোমর আর নুদুস নাদুস পায়ের ভীরু পদ চারনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দর্শকদের অবিরাম হর্ষধ্বনি আর হাততালিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে ফটোগ্রাফাররা ক্লিক ক্লিক শব্দে, রোজের ছবি নিতে থাকে। মুচকি হেসে সুন্দরী রোজ দর্শকদের অভিনন্দন মাথা নত করে গ্রহণ করে আর তাদের কুর্নিশ জানায়। এরপর আসে চীফ কমিশনার সাহেবের তিনকন্যা, প্রথমে সুধা মেহতা তারপর মাধুরী মেহতা আর সর্বশেষ আশা মেহতা। তাদের সৌন্দর্য মোটামুটি চলনসই, যার বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু চীফ কমিশনার সাহেবের কন্যা, তাই তার মন রাখার জন্য বিচারকমন্ডলী থেকে শুরু করে অনেকেই হাততালি দেন। কিন্তু আশা মেহতাকে দেখে দর্শকবৃন্দ হাততালি দিতেও ভুলে যান। কারণ মেকআপেও তার কুশ্রীরূপ ঢাকা পড়েনি। আশা মেহতা চলে গেলে যেন দর্শকরা হাফছেড়ে বাঁচলেন।

সীতা মেলহোত্রা একটা মিহি তসরের বেনারসী শাড়ি পরে এসে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। পরনের পেটিকোটও তার বেশ দামী। ভাব দেখে অনুমিত হয় পরনের পেটিকোট নাইলনের হলে বেশি নাম্বার মিলবে।

এবার এলেন দেবদাসী বেশে এলোকেশে খোপা বেঁধে মাথায় ফুল গুঁজে মৃণালিনী। এক নজরে এমন করে তাকিয়ে থাকে, যেন বনের হরিণ শহরে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। অতঃপর একে একে যমুনা প্রজেস, খুরশীদ গোরী প্রমুখ তরুণীরা বাইরে এসে নিজেদের রূপ যৌবন প্রদর্শন করে ভেতরে চলে যায়। সর্বশেষ এলো সুন্দরী রণভা সাথে সাথে ব্যান্ডের বাজনা বেজে উঠে। রণভা চোস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাজামা, কামিজ আর সেলোয়ার পরে এসে দর্শকদের অভিবাদন জানায়। তার দেহের প্রতিটা ভাঁজে ফুটে উঠেছিল যৌবনের রূপরেখা। দর্শকরা বাহবা দিতে থাকে। সকলের অভিমত, এবারের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রণভাই প্রথম স্থান অধিকার করবে।

প্রতিযোগী তরুণীদের মহড়া শেষ হলো, এবার বিচারকরা ক্লাবে গিয়ে শলাপরামর্শ করতে থাকেন কে প্রথম আর কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের যোগ্য গুণাগুণের দিক থেকে। দর্শকদের মধ্য জোর জল্পনা কল্পনা চলছে। সুন্দরীদের গুণাগুণ নিয়ে, কে প্রথম হবে এবার। অধিকাংশ অভিভাবক নিজ নিজ মেয়ের সৌন্দর্য চর্চায় ব্যস্ত। অধিকাংশ দর্শকই রণভার সপক্ষে রায় দিয়ে বসে সেই একমাত্র প্রথম হওয়ার যোগ্য। কেউ কেউ আবার জোবায়দা যমুনা প্রভৃতিকে প্রথম স্থান অধিকারের যোগ্য বলে রায় দিচ্ছে।

পনের বিশ মিনিট পর বিচারপতি দেশপান্ডে হাতে সুন্দরীদের তালিকার কাগজ নিয়ে দর্শকদের সামনে এসে হাজির হলেন; দর্শকদের গুঞ্জন স্তব্ধ। বিচারপতি দেশপান্ডে চশমা ঠিক করে নিয়ে ঘোষণা করলেন, সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিচারকমন্ডলী একমত হয়ে এ বছরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে গুণাগুণ বিচারের পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথমস্থান অধিকারের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন মিস সুধা মেহতা, দ্বিতীয় মিস মাধুরী মেহতা এবং তৃতীয় মিস জোবায়দা।

এদিকে চীফ কমিশনার সাহেবের বাড়িতে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এক সঙ্গে দুই তনয়া বিউটি কন্টেস্টে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু এতেও বেগম সাহেবা সন্তুষ্ট নন। কারণ আশা মেহতা বাড়িতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দু'বোন পুরস্কার পেয়েছে অথচ সে বাদ পড়েছে।

সন্ধ্যায় চীফ কমিশনার সাহেব ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরলে বেগম সাহেবা এক হাত নিলেন আর বললেন, "হায়, মেয়েটা সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে হয়রান, তুমি আশার দিকে একটুও খেয়াল করলে না। তুমি কিসের চীফ কমিশনার, যখন আমার মেয়েটা পুরস্কারই পেলনা সুধা আর মাধুরী তো বর পাবেই। অথচ যে মেয়েটার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া উচিত ছিল, তা দিলে না। হায় আমার কপাল - - - ।"

চীফ কমিশনার সাহেব গর্জন করে উঠেন, তুমি কি পাগল হয়েছ। তোমার দুই কন্যাকে যেকোন প্রকারে পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। আবার তৃতীয় কন্যাকেও যদি পুরস্কার দেয়া হয়, তাহলে লোকে কি বলবে বলতো! প্রকৃতপক্ষে ন্যায় বিচার বলে একটা প্রবাদ তো রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# আলো চাই, আলো

চারদিকে অন্ধকার। বন্দর রোডের প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে আকাশচুম্বী দালানগুলোতে অন্ধকার। সকলে ব্লাকআউট পালন করছে। দু'দিন আগেও নিষ্প্রদীপ মহড়া হয়েছে। কিন্তু আজকের মতো কড়াকড়ি হয়নি। আজ পুলিশ জীপে চড়ে সারাশহরে টহল দিচ্ছে এবং নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থায় গাফেলতির জন্য কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে। তাই সারাশহরে রাজপথ, গলি, বাজার, মহল্লায়, দোকানে সর্বত্র নিষ্প্রদীপ মহড়া কড়াকড়িভাবে পালিত হচ্ছে। সর্বত্র অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইট কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে যেন আলো রাস্তায় না পড়ে।

সরোজিনী ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বাসে বসেছিল। লোকাল গাড়িতে সে ভিড়ের জন্য উঠতে পারেনি। গাড়ির পাদানিতে পর্যন্ত যাত্রী ঝুলছে। সকলে বাড়ির দিকে ছুটছে স্রোতের ন্যায়। সরোজিনী তাই ট্রেনের বদলে দু'তিনটি বাসের পর একটি দু'তলা বাসে উঠে পড়ে। দু'তলা বাসের উপর তলায় সে সিট পায়। হাতঘড়ি দেখে, তখন সাড়ে সাতটা। বাড়ি পৌঁছতে নয়টা বাজবে। দু'টি ছেলেমেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েছে। আর তার স্বামী হয়তো বিছানায় শুয়ে শুয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত। দু'বছর থেকে তার স্বামী পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী। দেহের ডান অংশ অবশ হয়ে গেছে। দু'বছর আগে তার স্বামী ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল। মাসিক চারশ' পাঁচশ' টাকা আয় করতো। কিন্তু রোগাক্রান্ত হয়ে এখন একেবারে অচল। ট্যাক্সির মালিক তার চিকিৎসার জন্য ২/৩ মাস মাসিক ৫শ' টাকা করে দিয়ে এখন আর দেয়নি। কারণ মানুষের সাহায্য, সহানুভূতির ও দানেরও একটি সীমা আছে-যা এই সীমারেখা পর্যন্ত পৌঁছে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

সৌভাগ্যবশতঃ কয়েক মাসের মধ্যে মঙ্গোলরামের শাড়ির দোকানে সরোজিনী সেলস গার্লস হিসেবে চাকরি পায়। সরোজিনী মিডল স্কুল পর্যন্ত পড়েছে। দু'টি সন্তানের জননী কিন্তু দেহের গড়ন ও গাঁথুনি নিটোল। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। তাই প্রথম দেখাতেই মঙ্গোরাম তাকে চাকরিতে নিয়ে নেয়। বেতন মাত্র আড়াইশ' টাকা। স্বামীর রোজগার ছিল ৫শ' টাকা। সাংসারিক খরচ কোন অংশেই কমেনি। বাড়ি ভাড়া, খাওয়া খরচ, রেশন খরচ কোনটাই কমেনি বরং আগের মতই আছে। কিন্তু উপার্জন অর্ধেক হয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব সরোজিনী খরচ কমিয়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার ফুট দৈর্ঘ্য আর দশ ফুট প্রস্থের বস্তির কুঁড়েঘরে বসতি। ভাড়া মাসিক ১২ টাকা। লাইট ভাড়া ৫ টাকা। পানি ৩ টাকা। দৈনিক পানির জন্য লটারী হয়, যার নাম আগে আসবে সে প্রথমে কলে পানির সংগ্রহের সুযোগ পাবে। মাথাপিছু চার বালতির বেশি পানি দেয়া হয় না। পায়খানায় গিয়েও লাইনে দাঁড়াতে হয়। মেয়েরা পায়খানায় এক কিস্তিতে চারজন যেতে পারে, কিন্তু পুরুষেরা একজন। তাই পুরুষের মধ্যে পায়খানায় কে আগে যাবে তা নিয়ে রোজ ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে।

বস্তির কুঁড়েঘরে উনানে রান্না করাই মুস্কিল, পাছে আগুনের আলো বাইরে যায়। যারা দালানে থাকেন, তাদের কোন ঝামেলাই নেই, জানালার কাঁচে কালো কাগজ লাগিয়ে মোটা পর্দা ঝুলিয়ে অনায়াসে মোমবাতি জ্বেলে তারা বাড়ির কাজকর্ম সমাধা করেন। কিন্তু বাঁশের কুঁড়েঘরে বস্তিতে যারা বসবাস করে তাদের বড্ড জ্বালা। নিঃস্প্রদীপ মহড়া কিভাবে পালন করবে, ঘরে আগুন জ্বালালেই বাইরে থেকে সবকিছু দেখা যায় আর পুলিশ বাঁশি বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হয়। সরোজিনী উপলব্ধি করে, সর্বত্র কড়াকড়িভাবে ব্লাক আউট পালিত হওয়া উচিত। কিন্তু পেট তো মানে না।

যাদের স্বামী দিনে চাকরি করে তারা বেলা থাকতেই রান্নার কাজ সেরে নেয়। কিন্তু সরোজিনী কি করবে, তার উপায় কি? সারাদিন চাকরি করে রাতে ঘরে ফেরে। বাসে বসে সরোজিনী ভাবছিল।

দাদরে-বাস প্রায় খালি, অনেক যাত্রী নেমে পড়ে। সরোজিনী বাসে সম্পূর্ণ একা। চারদিকে নিস্তব্ধ আর অন্ধকার। হঠাৎ এক ঝটকায় বাস থেমে যায়। সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট স্টপেজ। সরোজিনী বাস থেকে নেমে সাউথ এ্যাণ্ড এভেন্যু থেকে এডওয়ার্ড এভেন্যু হয়ে সান্তাক্রুজের মধ্যবর্তী গলিতে পৌঁছতে পারলেই সরোজিনী বাড়ির কাছে পৌঁছে যাবে। যেখান থেকে সামান্য গেলেই তার বাড়ি। হঠাৎ বিপদের সাইরেন বাজতে থাকে। সরোজিনী ভীতসন্ত্রস্ত দ্রুতপদে এগুতে থাকে। তখনও অর্ধেক পথও অতিক্রম করতে পারেনি। বাসা থেকে অনেক দূরে। আকাশে বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় চারদিকে আলোকিত হয়ে উঠেছে। দূর থেকে জেট বিমানের গর্জনও শুনা যাচ্ছে। শত্রুর বিমান কি এখানেও হানা দিয়েছে? নিশ্চয় বিপদ দ্বারপ্রান্তে। নচেৎ সাউথ এ্যাণ্ড এভেন্যুর আশপাশে বাড়ি থেকে রেডিওর শব্দ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল কেন। শহরে দীর্ঘদিন যাবত নিস্প্রদীপ মহড়া চলছে। সে ঐটুকু জানে যে, বিমান হামলার সাইরেন বাজলে রেডিও বাজানো বন্ধ হয়ে যায়। আর পত্রপত্রিকায় ফটো দেখানো হয়েছে বিমান হামলার সংকেত ধ্বনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে পরিখায় কিভাবে আশ্রয় নিতে হয় বা পার্শ্ববর্তী দালানে নিরাপদ স্থানে কিভাবে শুয়ে পড়তে হয়। আশপাশে কোন পরিখাও দেখা যাচ্ছে না। সরোজিনীর বাড়িও অনেক দূরে।

সাইরেনে বিপদ সংকেত ধ্বনি আর বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। সরোজিনীর ভয়ে পা কাঁপতে থাকে মনে হয়, সে এক্ষুণি মাটিতে পড়ে যাবে। পাশে একটি বাংলোর গেট খোলা ছিল, সে নিজের অজান্তে ভিতরে প্রবেশ করে এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়ে। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে সে দেখতে পায় জানালার পাশে নাইট গাউন পরিহিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। সরোজিনী সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে কিন্তু তার পা যেন নিথর হয়ে পড়েছিল, তাই সে চলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলো। লোকটি সিগারেট টান দিয়ে মুখের ধোঁয়া জানালা দিয়ে বাইরে ছাড়ছিল। অন্ধকারে সরোজিনী লোকটিকে চিনতে পারেনি।

কয়েক মিনিট পর লোকটি পিছনে ফিরে তাকায় আর বলে, "দরজা খোলা রাখছো কেন? তাড়াতাড়ি বন্ধ কর। বোমার টুকরো ছিটকে এসে দু'জনকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করতে পারে।" সরোজিনী দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি দরজার খিল আটকে দেয়। লোকটি জানালা বন্ধ করে দেয়। লোকটি সরোজিনীর কাঁধে হাত দিয়ে ভদ্রভাবে অনুরোধ করে, "ভিতরের কামরায় চলো। এই করিডোরে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়" সরোজিনী অনুভব করল লোকটি তার কোমরে হাত দিয়ে ভিতরের কামরায় নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চিৎকার করা ইচ্ছা থাকলেও সে পারছে না, কারণ ব্লাক আউটের রাতে কে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তার দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে বিপদের সংকেত ধ্বনি বাজতে শুরু করেছে কিন্তু লোকটির শক্ত বাহুর বেষ্টনী থেকে তার পালিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। সরোজিনী চিৎকার করার চেষ্টা করলে লোকটি তার মুখ চেপে ধরে আর দু'হাতে এক রকম শূন্যে তুলে তাকে ভিতরের কামরায় নিয়ে যায়।

চারদিকে অন্ধকার। এই গাঢ় অন্ধকার এই বন্য পশুর ন্যায় লোকটির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাই বৃথা। ধীরে ধীরে তার আত্মরক্ষার প্রতিরোধ প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসে। অন্ধকার অক্টোপাসের ন্যায় তার চারদিকে ছেয়ে গেছে আর সব নিঃশেষ হয়ে গেছে এই অন্ধকার প্রহরে ।

তখন সরোজিনী লোকটির ড্রইং রুমে সোফায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সম্মুখের সোফায় লোকটি বসে সিগারেট ফুঁকছিল অবিরাম। এদিকে বিপদ কেটে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়ায় সাইরেন বেজে উঠে আর একটানা বাজতে থাকে কিন্তু সরোজিনীর কান্না থামেনি। হঠাৎ কামরার এককোণে রাখা রেডিওগ্রাম বেজে উঠে, হয়তো লোকটি সাইরেন বাজার আগে থেকেই রেডিও শুনছিল। বেতারে সংবাদ বুলেটিনে ধ্বনিত হল, "রাত ৯টা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হানাদার সৈন্য প্রবেশ করে দু'জন ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে এবং ....।" লোকটি খট করে রেডিও বন্ধ করে দেয়। কয়েক মিনিট যাবত লোকটি সোফায় বসে সিগারেট ফুঁকতে থাকে। অতঃপর পাশের একটি সুইসে টিপ দিলে জিরো পাওয়ারের বাল্বটি জ্বলে উঠে। বাল্বের সবুজ আলোয় লোকটি সরোজিনীকে আর সরোজিনী লোকটিকে চিনতে পারে। লোকটি আর কেউ নয়, যে দোকানে সরোজিনী চাকরি করে, সেই দোকানের মালিক মঙ্গোরাম। "আরে তুমি; সরোজিনী?" আর মঙ্গোরাম ভীত হয়ে দ্রুত পায়ে কাছে এসে বলে, "কাউকে বলো না। জানি না আমার আজ কি হয়েছিল, অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারিনি। যদি চিনতে পারতাম ....। ভগবানের দোহাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। কাউকে এ ব্যাপারে ঘূণাক্ষরেও জানাবে না। আমি তোমার বেতন আড়াইশ' থেকে তিনশ' করে দেব। যা চাও তাই দেব। বল তুমি কি চাও, বল?"

সরোজিনী আহত পাখির ন্যায় ছটফট করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে যেতে যেতে ভাঙ্গা গলায় ধীরে কণ্ঠে জবাব দেয়, "আমি আলো চাই, আমার আলো একান্ত প্রয়োজন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পেশোয়ার এক্সপ্রেস

আমি যখন পেশোয়ার স্টেশন ছেড়েছি, তখন আনন্দে এক গুচ্ছ ধোঁয়া উপর দিকে উঠতে দেখেছি। আমার ট্রেনের বগিতে ছিল খোপে খোপে হিন্দু আর শিখ শরণার্থীরা। তারা এসেছিলেন সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার কোহাট, চরসরা, হাটমর্দন, খাইবার, লান্ডিকোটাল, নওশেরা, মানশেরা প্রভৃতি স্থান থেকে। স্টেশনটি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর অফিসাররাও ছিল অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক। তবে, যতক্ষণ আমরা পঞ্চনদীর দেশের দিকে পাড়ি জমাইনি, ততক্ষণ তারা অস্বস্তিতেই ভুগছিল। অন্যান্য পাঁচজন পাঠানদের থেকে এইসব শরণার্থীদের পার্থক্য করা যাচ্ছিল না। তাদের চেহারা বেশ লম্বা ও সুদর্শন, পরনে লুঙ্গি ও কুর্তা, হাত-পায়ের গড়ন বেশ শক্ত, অনেকের পরনে সেলোয়ার। তাদের ভাষা পুশতু। প্রত্যেক খোপে দু'জন করে বেলুচী সৈন্য পাহারায় নিয়োজিত। হিন্দু-পাঠান ও তাদের বৌ-বাচ্চাদের দিকে স্মিত হাস্যে দাঁড়িয়েছিল, হাতে রাইফেল। এরা তাদের হাজার বছরের পুরনো বসতবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। সেখানকার পাহাড়ী জমি তাদের শক্তি-সাহস যুগিয়েছে, তার তুষার-ঝরণা তাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে এবং এই ভূমির রোদ-ঝলমল বাগান থেকে তোলা মিষ্টি আঙুরের স্বাদে তাদের প্রাণ ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন এই দেশ-গ্রাম তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল, শরণার্থীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাড়ি জমালো এক নতুন দেশে। তাদের জানমাল ও মেয়েদের ইজ্জত বাঁচিয়ে কোন রকমে যে চলে আসতে পেরেছে সে জন্য ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখে রাগে তাদের হৃদয়ে যেন রক্ত ঝরছিল। তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে বুকে যেন 'গ্রানাইট' বিদ্ধ হচ্ছিল আর অভিযোগ করছিল, "মাগো; কেন এভাবে নিজের সন্তানদের তাড়িয়ে দিচ্ছ? তোমার বুকে উষ্ণ আশ্রয় থেকে কেন মেয়েদের বঞ্চিত করলে? এসব নিরপরাধ কুমারী মেয়েরা তোমার শরীরে আঙুর লতার মতো জড়িয়ে ছিল এতদিন। কেন হঠাৎ তাদের টেনে হেচড়ে ছিড়ে ফেললে, মাগো মা।"

উপত্যকার মাঝখান দিয়ে আমরা দ্রুত ছুটছিলাম আর আমার গাড়িগুলোর মধ্য থেকে এই ক্যারাভানের দল বিষন্ন চোখ মেলে দেখছিল পেছনে ফেলে আসা মাল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমি, ছোট বড় উপত্যকা আর ঝির ঝির করে বয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা ছোট নদী। চোখের পানিতে যেন শেষবারের মত সবাইকে বিদায় জানাচ্ছে। প্রতিটি আনাচে কানাচে যেন ওদের চোখ আর বিদায় বেলায় যেন সবকিছু বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। আমারও মনে হল, চাকাগুলো বোধ হয় ভারী হয়ে পড়েছে। দুঃখ-বেদনায় যেন আটকে যাচ্ছে ওরা, আর চলার শক্তি নেই, বোধ হয় এবার থেমে পড়বে।

হাসান আবদাল স্টেশনে আরো শরণার্থীরা এসে হাজির। এরা শিখ, পাঞ্জা সাহেব থেকে এসেছে, সাথে লম্বা কৃপাণ, মুখে ভীতির চিহ্ন। ডাগর ডাগর চোখের শিশুগুলো পর্যন্ত যেন অজানা ভয়ে কুকড়ে রয়েছে। ওরা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার খোপে ঢুকে পড়ল। একজনের বাড়ি-ঘর সব হারিয়েছে, আরেকজনকে শুধু পরনের কাপড় নিয়ে, অপরজনের পায়ের জুতো পর্যন্ত নেই পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এক কোণায় বসে থাকা লোকটি ভাগ্যবান বলতে হয়, তিনি সবকিছু নিয়ে এসেছে সাথে, এমনকি ভাঙা কাঠের তক্তপোশ পর্যন্ত। যারা সবকিছু হারিয়েছে তারা নীরবে বসে আছে। আবার যে উদ্বাস্তু সারাজীবনে পিঠের টুকরো পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেনি, তার লাখ টাকা হারানোর গল্প শুনাচ্ছে আর নেড়েদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে। বেলুচী সৈন্যরা ডিউটিরত নীরবে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে।

আমাদের তক্ষশিলা স্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। স্টেশন মাস্টার জানালেন, "আশে পাশের গ্রাম থেকে একদল হিন্দু শরণার্থী আসছে। তাদের জন্য ট্রেনটি অপেক্ষা করছে।" এক ঘন্টা অতিক্রান্ত হল। আমার বগির লোকজন পালিয়ে আসার সময় সামান্য যা কিছু খাবার আনতে পেরেছিল, পোটলা খুলে তাই খেতে শুরু করলো। বাচ্চারা হৈ চৈ করছে আর তরুণীরা জানালার বাইরে শান্ত গম্ভীর চোখে তাকিয়েছিল। হঠাৎ দূরে ঢোলের শব্দ শুনা গেল। যাত্রী হিন্দু শরণার্থীদের একটি দল ট্রেনের দিকে আসছে। শ্লোগান দিতে দিতে ওরা এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দলটা স্টেশনের কাছে এসে গেলো। এক ঝাঁক গোলাগুলির শব্দ শুনা গেল, সাথে ঢোলের আওয়াজ। তরুণী মেয়েরা ভয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল। এই দলটি ছিল হিন্দু শরণার্থীদের দল– প্রতিবেশী মুসলমানদের আশ্রয়ে ছিল। প্রতিটি মুসলমানের কাঁধের উপর ঝুলছে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা এক-একজন কাফেরের লাশ। এ রকম দু'শ মৃতদেহ স্টেশনে এনে বেলুচী সৈন্যদের হাতে সোপর্দ করা হল। মুসলমান জনতার দাবি,এই মৃত হিন্দুদের যথাযথ মর্যাদার সাথে ভারত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বেলুচী সৈন্যরা লাশগুলো বুঝে নিয়ে প্রত্যেক বগির ভেতরে মাঝখানে কয়েকজন করে রেখে দিল। এরপর মুসলমান জনতা আকাশের দিকে বন্দুক উচিয়ে গুলি করলো এবং স্টেশন মাস্টারকে ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিল। আমি কেবলই চলতে শুরু করেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একজন চেন টেনে আমাকে থামিয়ে দিল। এরপর মুসলমান জনতার দলনেতা বললেন, এই দু'শজন শরণার্থী চলে যাওয়ায় তাদের গ্রাম শূন্য হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় ট্রেন থেকে দু'শজন হিন্দু ও শিখ শরণার্থীকে নামিয়ে দিতে হবে। ওরা ওদের গ্রামে থাকবে। কারণ দু'শ জনের শূন্যতা পূরণ করতে হবে। বেলুচী সৈন্যরা দেশপ্রেমের জন্য তাদের প্রশংসা করল এবং বিভিন্ন বগি থেকে দু'শজন শরণার্থীকে বেছে নিয়ে জনতার হাতে সোপর্দ করল।

"সব কাফেররা সরে দাঁড়াও" তাদের নেতা হুঙ্কার দিল। এই নেতা পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক প্রভাবশালী জমিদার। শরণার্থীরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওদের এক সারি লোক স্টেশনে দাঁড় করানো হল। দু'শ লোক যেন দু'শ জীবন্ত মৃতদেহ নগ্ন ভয়ে মুখগুলো সব নীল চোখের তারায় যেন ঝরে পড়ছে রক্তলোলুপ তীর ...।

বেলুচী সৈন্যরাই শুরু করল। পনের জন শরণার্থী তাল সামলাতে না পেরে মরে পড়ে গেল। জায়গাটা ছিল তক্ষশিলা স্টেশন। আরো কুড়িজন পড়ে গেলো।

এই তক্ষশিলায় ছিল এশিয়ার পবিত্রতম বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ছাত্ররা মানুষের সভ্যতার বিষয়ে তার প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল।

আরো পঞ্চাশজন মুখ থুবড়ে স্টেশনের প্লাটফরমে পড়ে মরল।

তক্ষশিলার জাদুঘরে সুন্দর সুন্দর মূর্তি ছিল। অলংকারের অতুলনীয় কারুকৃতি, দুর্লভ শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আমাদের সভ্যতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দীপ শিখার ন্যায়।

এবার আরও পঞ্চাশজন এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেল। এর পটভূমিতে ছিল সিরকপের রাজপ্রাসাদ, খেলাধুলার জন্য এক বিরাট থিয়েটার হল আর পেছনে কয়েক মাইল জুড়ে এক গৌরবোজ্জ্বল ও মহান নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

আরো তিরিশজন মারা গেল। এখানে রাজত্ব করতো কণিষ্ক। ওঁর রাজত্বে প্রজাদের ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি আর ভ্রাতৃত্ববোধ।

তারা আরো কুড়িজনকে মেরে ফেলল। এই গ্রামগুলোতেই একদিন বুদ্ধের সেই মহান সংগীতের গুঞ্জণ শোনা যেত। ভিক্ষুরা এখানেই ভেবেছিলেন প্রেমের আর সত্যের সৌন্দর্যের বাণী আর নতুন ধরণের জীবন যাপনের স্বপ্ন।

এখন সেই দু'শ জনের মধ্যে মাত্র শেষ কয়েকজন মৃত্যুর শেষ লগ্নের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইসলামের বাঁকা চাঁদ এখানে আকাশে প্রথম আলো জ্বালিয়েছিল ভ্রাতৃত্ব, সাম্য আর মানবতার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই এখন লাশ। আল্লাহু আকবর। প্লাটফর্মের উপর দিয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে এবং এত ঘটনার পর যখন আবার আমি রওয়ানা দিলাম; আমার মনে হল যে, এমনকি আমার নিচের লোহার চাকাগুলো যেন পিছলে যাচ্ছে বার বার।

গাড়ির প্রতিটি বগিকেই মৃত্যুর হিমেল ছোয়া স্পর্শ করেছে। মৃতদেহ মাঝখানে শোয়ানো আর চারপাশে জীবন্ত মৃতরা বসে আছে ট্রেনের সিটে। কোথাও একটি বাচ্চা কেঁদে উঠছে এক কোণায় মা ফোঁপিয়ে কাঁদছে। এক স্ত্রী তার মৃত স্বামীর দেহ আঁকড়ে ছিল। আমি ছুটতে লাগলাম ভয়ে আর রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে এসে পৌছলাম।

এখানে আমাদের জন্য কোন শরণার্থী প্রতীক্ষায় ছিলনা। কেবল বিশজন পর্দানসীন মহিলাকে সাথে নিয়ে কয়েকজন মুসলমান যুবক আমার একটি বগির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওদের সাথে ছিল রাইফেল, সঙ্গে কয়েকবাক্স গোলাবারুদ। তারা আমাকে ঝিলাম আর গুজর খাঁ এর মধ্যবর্তী স্থানে থামিয়ে নামতে লাগল। হঠাৎ সাথে আসা পর্দানশীন মহিলারা বোরকার পর্দা তুলে চীৎকার শুরু করল, "আমরা শিখ, আমরা হিন্দু, ওরা জোর করে আমাদের নিয়ে এসেছে। যুবকরা হেসে উঠল, ওরা তো আমাদের লুটেরমাল। ওদের তো ঘর থেকে জোর করেই এনেছি। যেভাবে ইচ্ছা আমরা ব্যবহার করবো। কে বাধা দেবে?"

দু'জন হিন্দু পাঠান ওদের উদ্ধারের জন্য লাফ দিল। বেলুচী সৈন্যরা ওদের শেষ করে দিল। আরো কয়েকজন চেষ্টা করলো। তারাও কয়েক মিনিটে খতম। তারপর ঐ তরুণী মেয়েদের টানতে-টানতে কাছের এক বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। আমি কালো ধোঁয়ায় মুখ আড়াল করে সেখান ছুটে গেলাম সামনের দিকে। মনে হল, আমার লোহার ইঞ্জিনের হৃৎপিন্ড ফেটে যাবে, আর আমার মধ্যকার লাল গণগনে আগুনের শিখা যেন গিলে খাবে এই ঘন বিরাট জঙ্গলকে, যা আমার লজ্জার সাক্ষী।

'লালামুসা স্টেশনের কাছাকাছি এসেছি। মৃতদেহের দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়ল। বেলুচী সৈন্যরা সিদ্ধান্ত নিল। এগুলোকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে। যে সব যাত্রীকে দেখতে তাদের মনঃপুত নয় এমনি একজন কে নির্দেশ দেয়া হবে, মৃতদেহ ট্রেনের দরজার কাছে নিয়ে আসতে, তারপর দরজার কাছে আসলে তাকেসহ মৃতদেহকে বাইরে ফেলে দেয়া হবে।

লালামুসা থেকে এসেছি আমি ওয়াজিরাবাদ। ওয়াজিরাবাদ হল পাঞ্জাবের অত্যন্ত পরিচিত শহর। সারা ভারতে ওয়াজিরাবাদ থেকে ছুরি রপ্তানী করা হয়। আর এই ছোরা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানরা পরস্পরকে হত্যা করে। ওয়াজিরাবাদে অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত বৈশাখী উৎসব। এই বৈশাখী উৎসবে হিন্দু-মুসলমানরা নবান্ন উৎসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একত্রিত হয়। আমি যখন ওয়াজিরাবাদ পৌঁছিলাম। দেখি চারিদিকে শুধু মৃতদেহ ছড়ানো ছিটানো। অনেক দূরে শহরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, আর স্টেশনের কাছে কাঁসার ঘন্টা ধ্বনি, অট্টহাসি আর উন্মত্ত জনতার করতালি। মনে হল বৈশাখী উৎসব।

জনতা প্লাটফরমের দিকে এগিয়ে এল, সঙ্গে একদল উলঙ্গ মেয়েলোক। তাদেরকে ঘিরে নাচতে গাইতে গাইতে ওরা এল। স্ত্রীলোকগুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের মাঝে ছিল বৃদ্ধা ও তরুণী, ছিল বাচ্চারা; নগ্নতা নিয়ে যাদের কোন চিন্তা ভয় নেই। ওদের চারিদিকে ঘিরে পুরুষেরা নৃত্য করছে গাইছে। মেয়েরা সব হিন্দু শিখ আর পুরুষেরা মুসলমান এবং তিন সম্প্রদায় মিলেই যেন বৈশাখী উৎসব করছে। মেয়েরা হেঁটে চলছে। তাদের চুল আলো তালো। দেহ উলঙ্গ কিন্তু তবুও তারা সোজা হয়ে হেঁটে চলেছে, যেন হাজারো শাড়িতে তাদের দেহ আবৃত। চোখে কোন ঘৃণার রেশ মাত্র নেই। লক্ষ সীতার অকলঙ্কিত অহংকারে তাদের দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে।

তাদের চারিদিকে জনতার শ্লোগান, "পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ জিন্দাবাদ।"

বিচিত্র এই শোভাযাত্রা সরাসরি এসে গাড়ির সামনে জড়ো হল। এই দৃশ্য দেখে ট্রেনের শরণার্থী মেয়েরা আঁচলে মুখ লুকায় আর পুরুষেরা দ্রুত জানালা বন্ধ করতে শুরু করে।

বেলুচী সৈন্যরা গর্জে উঠে, "জানালা বন্ধ করবেনা, তাজা হাওয়া প্রবেশ করতে দাও।"কিন্তু যাত্রীরা সৈন্যদের কথা গ্রাহ্য না করায় সৈন্যরা গুলি চালালো। কয়েকজন শরণার্থী মারা গেল। অন্যরা সরে বসলো। কয়েক মুহূর্তে সব জানালা খুলে গেল।

এই উলঙ্গ স্ত্রীলোকদের ট্রেনে উঠে শরণার্থীদের মাঝে বসে পড়তে বলা হল। তারপর তারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ; কায়েদে আজম জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে আমাকে বিদায় জানাল।

রোগা একটা বাচ্চা একজন বৃদ্ধানগ্ন মহিলাকে বলল, "মা, তুমি কি এক্ষুণিই স্নান করেছ?"

"হাঁ, বাবা, আমার দেশের ছেলেরা আজ আমার ভাইয়েরা আমাকে গোসল করিয়েছে।"

তাহালে কাপড় চোপড় কোথায়?

বাবা, আমার বিধবার রক্তে ঐ কাপড়ে দাগ লেগেছিল। তাই আমার ভাইয়েরা সে কাপড় চোপড় নিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যখন ছুটছি তখন দুই উলঙ্গ তরুণী আমার গাড়ির দরজা নিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠি আর লাহোর না পৌছা পর্যন্ত দ্রুত ছুটতে থাকি।

লাহোর একনম্বর প্লাটফর্ম এসে থামলাম। আমার উল্টো দিকে দু'নম্বর প্লাট ফরমে দাঁড়িয়েছিল অমৃতসর থেকে আসা একটি ট্রেন। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ট্রেনটি মুসলমান শরণার্থীদের বয়ে এনেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমান রক্ষীরা আমার গাড়ীর প্রতিটি বগিতে তল্লাশি চালাল। টাকা পয়সা, গয়নাগাটি ও মূল্যবান মালামাল সব কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর ওরা চারশ' শরণার্থীকে নির্বাচন করল বদলী হত্যার জন্য। ব্যাপারটা হল, মুসলমান শরণার্থী বহনকারী অমৃতসর থেকে আগত ট্রেন পথে আক্রান্ত হয়েছে এবং চারশ' মুসলমান নিহত এবং পঞ্চাশজন স্ত্রীলোককে লুট করা হয়েছে। কাজেই এখন ঠিক চারশ' হিন্দু ও শিখ শরণার্থীকে হত্যা করতে হবে এবং পঞ্চাশজন হিন্দু ও শিখ মহিলার ইজ্জত লুটতে হবে যাতে পাকিস্তান হিন্দুস্তানের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

মোগলপুরায় সৈন্য বদল হল। এবার এল শিখ, রাজপুত ও ডোগরা সৈন্য। আতারি স্টেশন থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা অসংখ্য মুসলমান শরণার্থীদের মৃতদেহ দেখতে পেলো। এতে সুস্পষ্ট যে, তারা স্বাধীন ভারতের সীমান্তের অতি নিকটে এসে গেছে।

অমৃতসর থেকে চারজন ব্রাহ্মণ আমার গাড়িতে উঠল। ওরা হরিদ্বারে যাচ্ছে। তাদের মাথা ন্যাড়া; কপালে তিলক, রাম নাম ছাপা ধূতি পরে ওরা তীর্থে যাচ্ছে। অমৃতসর থেকে বন্দুক, বর্শা ও কৃপান হাতে দলে দলে হিন্দু শিখরা পূর্ব পাঞ্জাবে গমনকারী ট্রেনে উঠে বসল। এরা শিকারের খোঁজে ঘুরছে। তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণদের দেখে ওদের সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করল, "ব্রাহ্মণ দেবতা, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

হরিদ্বারে ।

হরিদ্বারে না পাকিস্তানে। একজন ইয়ার্কি করে বলল। একজন হেসে বলল, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি। তাহলে খতম করা হোক। সে হাক দিল নাথা সিং, নাথা সিং; এদিকে এস, বড়ো শিকার পাওয়া গেছে। ওরা একজনকে খুন করল। অন্য তিনজন ব্রাহ্মণ পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের ধরে ফেললো। নাথা সিং চীৎকার করে বলল, হরিদ্বারে যাওয়ার আগে তোমাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হবে। ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল ওদের 'খতনা' করা হয়েছে।

তারপর ঐ তিনজন ব্রাহ্মণকেও হত্যা করা হল।

হঠাৎ এক ঘন অরণ্যের ধারে আমাকে থামানো হল। সেখানে হঠাৎ আমি শ্লোগান শুনতে পেলাম।, "সৎশ্রী আকাল হর হর মহাদেব আর দেখলাম সৈন্যরা শিখ ও হিন্দু শরণার্থীরা ট্রেন ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানদের ভয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু সেটা আমার ভুল। ওরা যাচ্ছে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য নয় বরং কয়েকশ গরীব মুসলমান চাষীদের হত্যা করতে। এরা স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। আধঘন্টার মধ্যে সব শেষ। বিজয়ী বেশে সকলে ফিরে এল। একজন জাঠ বর্শার ডগায় একজন মুসলমান শিশুর মৃতদেহ দোলাতে-দোলাতে গান গাইছিল "হো হো কাল বৈশাখী।"

জলন্ধরের কাছে পাঠান বসতির একটা গ্রাম ছিল। এখানে আবার আমাকে চেন টেনে থামানো হল। আর সবাই নেমে আবার ছুটল ঐ গ্রামের দিকে। পাঠানরা এদের সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ করেছিল কিন্তু আক্রমণকারীরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি ও অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত। গ্রামের পুরুষরা প্রতিরোধ করে জীবন দিল। এবার মেয়েদের পালা। এখানে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠের পাশে গাছের নিচে তাদের ইজ্জত কেড়ে নেয়া হল। এই হল পাঞ্জাবের সেই মাঠ, যেখানে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ চাষীরা একত্রে সোনার ফসল ফলাতো। সেখানে সরষের সবুজ পাতায় ও হলুদ ফুলে সমস্ত গ্রামাঞ্চল এক স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হতো। এই সব পিপুল, শীষম ও সারিন গাছের নিচে ছায়ায় সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর স্বামীরা অপেক্ষা করতো কখন তাদের প্রিয়তমা স্ত্রী খাবার নিয়ে আসবে। ঐ যে মাঠের ধারের আইল দিয়ে ওরা সারি বেঁধে আসছে। হাতের কলসীর মধ্যে লস্যি, আর মধু, গমের চাপাতি আর মাখন। তৃষ্ণাতুর চোখে কৃষকরা চেয়ে থাকতো কিষাণী বধুর দিকে, তাদের চাহনীতে বউদের বুক কেঁপে উঠত। এটাই পাঞ্জাবের হৃদয়। এখানেই জন্ম নিয়েছিল সোনি আর মাহিওয়াল, হীর ও রঞ্জা। আর এখন পঞ্চাশজন নেকড়ে পঞ্চাশজন সোনি আর পাঁচশ' মাহিওয়াল। এ পৃথিবী আর কখনও আগের মতো হবে না। চেনাব নদী আর কখনও ঝির ঝির করে বয়ে যাবে না। হীরাঞ্জা আর সোনি মাহিওয়ালের এবং মীর্জা সাহেবানদের গানের সুর কখনও হৃদয়ে ঠিক আগের মতো গুঞ্জন তুলবেনা।

লক্ষ অভিশাপ নেমে আসুক এই সব নেতাদের মাথায় আর তাদের সাত পুরুষের মাথায় যারা এই সুন্দর মর্যাদাশীল ভূখন্ডকে অসম্মান ও হত্যার মহোৎসবে এনে হাজির করেছে, যারা এদের শরীরে হত্যা, লুটতরাজ ও ধর্ষণের জীবাণুর বীজ ঢুকিয়েছে। পাঞ্জাব আজ মৃত। এর সংস্কৃতি মরে গেছে। এর ভাষার মৃত্যু হয়েছে। মৃত এর সংগীত। আমার যদিও চোখ কান কিছুই নেই, তবুও আমি এই মৃত্যু দৃশ্য দেখলাম, শুনতে পেলাম মৃত পথযাত্রী মানুষের কাতর ধ্বনি।

শরণার্থী ও সৈন্যরা পাঠান নারী পুরুষের মৃতদেহ বহন করে স্টেশনে ফিরে এল। আবার কয়েক মাইল যাওয়ার পর একটি খাল পাওয়া গেল। এখানে আমাকে থামানো হল। এইখানে লাশগুলোকে জড়ো করে ফেলে দেয়া হল এবং আমি তারপর এগিয়ে যাচ্ছি। যাত্রীরা সকলে দারুণ খুশী। রক্ত ও ঘৃণার স্বাদ তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছে এবং এখন দেশী মদের বোতল খুলে তারা আনন্দে ফূর্তি করতে মেতে উঠল।

আবার আমরা লুধিয়ানায় থামলাম। এখানে লুটেরারা শহরে ঢুকে মুসলমান মহল্লা ও দোকানে আক্রমণ করলো। ঘন্টা দুয়েক বাদে তারা স্টেশনে ফিরে এল। সমস্ত পথে ঘাটে তাদের লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এতক্ষণে আমার বুকে অনেক ক্ষত জমেছে এবং আমার কাঠের শরীরে রক্তের দাগে এত ময়লা পড়ে যে, আমার গোসলের দরকার কিন্তু আমি জানি, পথের মধ্যে আমার এ সুযোগ হবে না।

অনেক রাতে আম্বালা পৌঁছলাম। এখানে একজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের সেনাবাহিনীর প্রহরায় আমার গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় তুলে দেয়া হল। সৈন্যদেরকে এই মুসলমান সরকারী কর্মকর্তার জীবন ও সম্পত্তির যেন ক্ষতি না হয় তজ্জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হল। রাত দুটোয় আম্বালা ত্যাগ করি। মাইল দশেকও যাইনি, এমন সময় চেন টানল। মুসলমান কর্মকর্তা যে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে যাচ্ছিলেন, তার দরজা বন্ধ। কাজেই তারা জানালার কাঁচ ভেঙে তারা ঐ মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তার স্ত্রী ও তিনটি শিশুকে হত্যা করলো। ডেপুটি কমিশনারের একটি অল্প বয়সী মেয়ে ছিল। সে খুব সুন্দরী। তাই তারা ওকে খুন করেনি। ওরা মেয়েটিকে, গয়নাপত্র ও ক্যাশবাক্স নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। মেয়েটির হাতে একটি বই ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে ওরা শলাপরামর্শে বসল। মেয়েটিকে নিয়ে কি করা হবে? ওকে হত্যা করবে, নাকি বাঁচিয়ে রাখবে। মেয়েটি বলল, "আমাকে খুন করার দরকার নেই। আমি তোমাদের ধর্মে দীক্ষা নেব এবং তোমাদের একজনকে বিয়ে করবো।

"মেয়েটি তো ঠিক কথাই বলেছে," একজন তরুণ বলল,"আমার মনে হয় ওকে আমাদের ।" আর একজন তরুণ তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটির পেটে একটা ছোরা বসিয়ে বলল, "আমার মনে হয়, ওকে এখানেই খতম করা উচিত। এ সব বৈঠক করে লাভ নেই। চলো, ফিরে যাই।"

মেয়েটি ওদের হাতে নিহত হল। জঙ্গলের শুকনো ঘাসের উপর আর ওর হাতের বইখানা তারই দেহে রক্তে রঞ্জিত হল। বইটা ছিল সমাজতন্ত্র বিষয়ক। হয়তো মেয়েটি ছিল খুবই বুদ্ধিমতি, বড় হয়ে দেশ ও জাতির সেবা করতো। হয়তো সে কাউকে ভালবাসতো, তার ভালাবাসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল, উদগ্রীব ছিল প্রেমিকের আলিঙ্গনের জন্য, নিজের সন্তানকে চুমো দেয়ার জন্য। সে তো ছিল মেয়ে, কারো প্রিয়তমা অথবা জননী আর এখন সে এই জঙ্গলে লাশ হয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলো। শকুনে শেয়ালে তার লাশ টেনে ছিড়ে খাবে। সমাজতন্ত্র ও তত্ত্ব বাস্তবায়ন জানোয়াররা সব খেয়ে ফেলেছে।

হতাশ রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমি এগিয়ে চলছি। দেশী মদ খেয়ে মাতাল কিছু লোকজন আমার গাড়িতে রয়েছে। ওরা শ্লোগান দিচ্ছে "মহাত্মা গান্ধীর জয়।"

বোম্বাই এসেছি অনেকদিন পর। এখানে ওরা আমাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে শেডের মধ্যে রেখে দেয়। আমার শরীরে এখন আর রক্তের দাগ নেই। খুনীদের হৈহুল্লোড় আর শ্লোগান নেই। কিন্তু রাতে যখন একলা থাকি, মৃত আত্মারা যেন ভূত হয়ে আবার জেগে উঠে। জোরে আহত শরণার্থীরা চীৎকার করে, নারী শিশুরা ভয়ে কঁকিয়ে উঠে। আর আমি সর্বদা কামনা করি, আমাকে যেন এই ভয়ানক যাত্রায় কেউ না নিয়ে যায়। এই ভয়াবহ যাত্রার জন্য আমি এই শেড ছাড়তে রাজী নই। কিন্তু আমি ঠিকই সুন্দর যাত্রার জন্য প্রস্তুত, সে যাত্রা হবে দীর্ঘ গ্রাম-গঞ্জের মধ্যদিয়ে, যখন পাঞ্জাবের মাঠ সোনালী ফসলে আবার ভরে উঠবে। তখন সরষে ফুলের ক্ষেত দেখে মনে হবে হীর রাঞ্জার অমর প্রেমের গান গাইছে। তখন হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই একত্রে মাঠে চাষ করবে। বীজ বুনবে, ঘরে ফসল তুলবে এবং প্রেম ও পূজায় এবং নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাদের হৃদয় আবার পূর্ণতায় ভরে উঠবে।

আমি একটি সামান্য কাঠের তৈরি ট্রেন। কেউ প্রতিশোধ ও ঘৃণার এমন জঘন্য ভারী বোঝা কেউ আমার পিঠে চাপিয়ে দিক। তা আমি চাইনা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে আমাকে দিয়ে খাদ্য বহন করা হোক। গ্রামে চাষীদের জন্য আমাকে দিয়ে ট্রাক্টর আর সার বহন করে নিয়ে যাওয়া হোক। আমাকে যেখানে নিয়ে যাক না কেন। মৃত্যু ও ধ্বংসের মাঝে যেন না নেওয়া হয়।

আমি চাই, আমার গাড়ির প্রতিটি বগিতে থাকবে বিত্তবান চাষী ও শ্রমিকের দল এবং তাদের সুখী স্ত্রী-পুত্র সন্তান-সন্ততি আনন্দ ফুর্তিতে মশগুল, তাদের হাসি যেন পদ্মফুল। এইসব শিশুরাই এক নতুন জীবন পদ্ধতি গড়ে তুলবে যেখানে মানুষ হিন্দু ও মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবে না, শুধু পরিচিত হবে একমাত্র মানুষ হিসেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# মন্ত্রীর অসুখ

টাইমস পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর ৫ই ফেব্রুয়ারী।

ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী গজানন্দ আজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজের সরকারি বাংলোর বারান্দায় বসে তরমুজ খাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত তরমুজ খাওয়ার ফলে হঠাৎ তাঁর পেটে ব্যথা হয়। আর সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি অবশ্য একটি দরকারী কথা বলেছেন, তার পদ যেন কাউকে না দেয়া হয়।

দৈনিক ক্রনিকলের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রথম পৃষ্ঠার খবর।

আজ ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে সাথে সাথে সাতজন নামকরা ডাক্তারকে ডাকা হয়। তার পেটের বৃদ্ধি এবং অবস্থা দেখে ডাক্তাররা মত দেন যে, মন্ত্রী মহোদয়ের চিকিৎসার জন্য ভেটারনারী সার্জন দরকার। তাই রাজধানীর সবচেয়ে নামকরা ভেটারনারী সার্জন ডাঃ এস কে পোখর,ডি ডি টি বি আই পি কে চার্টার্ড করা স্পেশাল প্লেনে রাজধানী ভূষিনগরে পাঠানো হয়। উচ্চমহলে সকলে বিশেষভাবে চিন্তিত যে, মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ অথচ তার পদের দায়িত্ব কাউকে দেয়া হচ্ছে না।

আজ ভূষি প্রান্তরের আর একজন বড় নেতা শ্রী ভূজানন্দ রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। শ্রী গজানন্দ অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভূজানন্দ ছিলেন তার দক্ষিণ হস্ত। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি হাইকমান্ডকে বলতে বলেছেন, শ্রী গজানন্দের পরিবর্তে যদি ভূজানন্দকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় তবে পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা অবশ্যই সাতবছরে শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

স্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রথম পৃষ্ঠার রিপোর্ট।

শ্রী গজানন্দ এখনও অজ্ঞান অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু তার দায়িত্ব কাউকেও অর্পণ করা হয়নি। অচেতন অবস্থায় তার মুখ থেকে বিড়বিড় করে যা বের হচ্ছে, সেটা চীফ সেক্রেটারী সাথে সাথে নোট করে নিচ্ছে আর তা একজন জ্যোতিষীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই জ্যোতিষী সাতবছর যাবত শ্রী গজানন্দের জ্যোতিষী। তিনি প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাথে মন্ত্রণালয়ের কাজ চালাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮ই ফেব্রুয়ারী এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার রিপোর্ট।

শ্রী গজানন্দ এখনও অচেতন। তার মন্ত্রীত্বের কাজ যথারীতি চলছে। চীফ ভেটারনারী সার্জন এস কে পোখরকে সহযোগিতা করার জন্য অস্ট্রেলিয়া থেকে মিঃ ওলেনকে আনা হচ্ছে।

মিঃ ওলেন অস্ট্রেলিয়ার ভেড়ার অসুখ বিশেষজ্ঞ। রোগী দেখার পর মিঃ ওলেন বিস্মিত। জিজ্ঞাসা করেন, ওনার এই রোগ কিভাবে হল। এ রোগ তো অস্ট্রেলিয়ার ভেড়ার রোগ। আর এই রোগ যে সব ভেড়াদের লোম খুব মোটা এবং ত্বকের গভীর পর্যন্ত থাকে তাদের হয়। গজানন্দের শরীরে প্রচুর লোম আছে কিন্তু এই লোম তো উল নয়– তাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

৯ই ফেব্রুয়ারী 'টাইমস' এর প্রথম পৃষ্ঠার রিপোর্ট।

ভূষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন অজ্ঞান অবস্থায় আছে তাই আঞ্চলিক কেবিনেট যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, ফলে কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড ভাবছিলেন, যদি অন্যান্য অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদেরও অচেতন করা যায় তাহলে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম দ্রুত অগ্রসর হবে। অচেতন অবস্থায় দেশ পরিচালনার প্রস্তাব সম্পর্কে খুব গভীরভাবে বিবেচনা হচ্ছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী টাইমস এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর।

ডাঃ ওলেন অস্ট্রেলিয়া ফিরে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর রহস্যজনক অচেতনতার কোন চিকিৎসা তিনি করতে পারেননি। তার ধারণা এটা ভেড়ার নয় বরং সম্বরের রোগ। ডাঃ ওলেন যেহেতু সম্বরের রোগের বিশেষজ্ঞ নন। তাই দেশে ফিরে গেছেন। এখন ভূষি অঞ্চলের সাতজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরা শ্রী গজানন্দের বিষয়ে প্রতিদিন একটি বুলেটিন প্রকাশ করবেন। এই বোর্ডে মিস ঘাসলেটম আছেন। যিনি মার্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। জনশ্রুতি আছে, তার সঙ্গীতে রোগ সেরে যায়।

১১ই ফেব্রুয়ারী অবজার্ভার পত্রিকায় সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্ট।

শ্রী গজানন্দের অবস্থা গুরুতর। তার পদের দায়িত্বের চাপ রক্তচাপের বেশি। শ্বাস-প্রশ্বাস কম হচ্ছে কিন্তু নাক ডাকছে। এমন জোরে নাক ডাকছে যে সারারাত্রি নাকের জেগে থাকতে কোন আপত্তি নেই।

গত রাতে মিস ঘাসলেটম কর্ণাটক মিউজিক শুনিয়েছেন। কিন্তু রোগীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উনি আগের মতোই অচেতন অবস্থায় আছেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেতন হওয়ার দিন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পেট ক্রমশঃ ফুলে যাচ্ছে। ডাঃ সোডাওয়ালার অভিমত, রোগী 'গর্ভবতী'। কিন্তু মহিলা নন, পুরুষ। সুতরাং তিনি কিভাবে 'গর্ভবতী হবেন। ডাঃ সোডাওয়ালা ফরাসী মেডিকেল জার্নালের উদাহরণ দিয়ে বলেন, বিশেষ অবস্থায় পুরুষও গর্ভধারণ করতে পারে। তার বক্তব্য শুনে মিস ঘাসলেটম রেগে যান এবং মেডিকেল বুলেটিনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন, জোরপূর্বক মহিলাদের বিভাগে পুরুষেরা কিভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

আজ মিস ঘাসলেটম রোগীকে ইমন কল্যাণ খেয়াল শুনিয়েছেন। শুনতে শুনতে রোগী আরো বেহুশ হয়ে পড়েছেন–অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। লণ্ডন থেকে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ টায়মজ বর্থকে আনা হল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, স্টান্ডার্ড পত্রিকার খবর।

ডাঃ দুবধা রায়ের অভিমত রোগী গর্ভধারণ করেনি। রোগীর পেটে ভাষণ ফেটে গিয়েছে। অচেতন হওয়ার পূর্বে রোগীর ভাষণ দেয়ার রোগ ছিল।

এখন অজ্ঞান হওয়ার জন্য তার ভাষণ কণ্ঠ থেকে বের হচ্ছে না। ফলে ভাষণ আবার তাঁর পেটের মধ্যে ফিরে গেছে। পেটের মধ্যে গিয়ে ভাষণগুলো একত্রিত হয়েছে। তাই রোগীর পেট বেলুনের মতো ফুলে যাচ্ছে।

ডাঃ দুবধা রায়ের সন্দেহ, যদি রোগী এভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন আর ভাষণ দিতে না পারেন–তবে শীঘ্রই পেট ফেটে তার মৃত্যু হবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী টাইমস এর রিপোর্ট।

মুখ্যমন্ত্রীর পেটে অপারেশন করলে ভাষণ বেরিয়ে যাবে।

ভূষি অঞ্চলের সচিবালয়ের এক ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রী পেটে অপারেশন করা হবে। পেটের বাইরে একটি মাইক্রোফোন রাখা হবে এবং মাইক্রোফোনের একটি টিউব পেটের মধ্যে দেয়া হবে।

এই পদ্ধতিতে পেটের ভেতর থেকে ভাষণ বের করা হবে। হাজার হাজার জনতা সরকারি হাসপাতালের বাইরে জমায়েত হয়েছে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষণ তাদের হৃদয়ে এমনকি পেটেও স্থান দেবেন–যেদিকে পেটের ভেতর খালি আছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, অবজার্ভার এর খবর।

বিশ্বে প্রথম ভাষণযুক্ত পেটের অস্ত্রোপাচার। মুখ্যমন্ত্রীর পেট থেকে তিনশত ভাষণ বের হয়েছে। ডাঃ টায়মজ বর্থ এর অসাধারণ অপারেশন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, এক্সপ্রেস পত্রিকার খবর।

ডাক্তারের বুলেটিনে বলা হয়েছে, এখন রোগীর অবস্থা ভাল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী 'টাইমস' এর রিপোর্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ রোগীর অবস্থা ভাল নয়।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী 'টাইমস'এর রিপোর্ট

আজ ভূষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী দুই আউন্স খিচুড়ি এবং দেড় আউন্স মসুরের ডালের সুপ খেয়েছেন। নিজের বেডে শুয়ে তিনি রেডিওর জন্য দীর্ঘ সতেরো পৃষ্ঠার এক ভাষণ প্রচার করেন। এই ভাষণে তিনি শ্রী গজানন্দের নাম উল্লেখ না করে বলেন যে, তার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে উনি তাকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, এমন একজন ধোঁকাবাজ থেকে জনসাধারণকে দূরে থাকতে হবে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী স্টান্ডার্ড পত্রিকার খবর।

আজ ভূষি প্রান্তরের মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তাঁর অসুস্থতার আগেই তিনি বহু তরমুজ বমি করে বের করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন তরমুজ কেটে টুকরো টুকরো করে তিনি জনসাধারণের মাঝে বিলি করছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পেটে ব্যথা হয়। তার পেটে যে ব্যথা ওঠে, আসলে তা জনসাধারণের জন্য সহানুভূতি ও ভালোবাসা।

মুখ্যমন্ত্রী আজ তার রোগশয্যায় পনেরো মিনিটের জন্যে উঠে বসেন। সকালের নাস্তা ভিন্ডিভাজা দেয়া হয়েছে । দুপুরে তাঁকে দুই আউন্স বোথুয়া শাক দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। অবশ্য তাঁকে দুপুরে অরহর ডালের সুপ দেয়া হয়।

২রা মার্চ,এক্সপ্রেস পত্রিকার খবর।

ডাক্তারদের বুলেটিনে বলা হয়, আজ ভূষি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং হোম থেকে বাসভবনে ফিরে গেছেন। নার্সিং হোমে ডাক্তাররা তাকে ভালভাবে চেক আপ করেছেন। তার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। হৃদয়, মন, পেট, ফুসফুস, যকৃত– সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ কোন অসুবিধা নেই। ডাক্তাররা শ্রী গজানন্দকে আশ্বাস দেন। তিনি সংসদের বৈঠকে যোগ দেবেন।

৩রা মার্চ, স্টান্ডার্ড পত্রিকার খবর।

আজ মেডিকেল বোর্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আগামীকাল সদস্যদের মুখ্যমন্ত্রী ভূষি প্রান্তরের আইন সভায় যোগ দেবেন এবং সেখানে নিজের পার্টির সদস্যের কাছে শ্রী ভুজ্জানন্দের পার্টি শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

৪ মার্চ, টাইমস পত্রিকার রিপোর্ট।

আজ আইন পরিষদে যাত্রার সময় হঠাৎ হার্টফেল করে শ্রী গজানন্দ মারা গেছেন।

শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে এবং তরমুজ বিক্রির উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

শ্রী ভূজ্জানন্দ হাইকমাণ্ডের সাথে আলাপ আলোচনার পর নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা

সর্বপ্রথম উপমন্ত্রী পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রীকে বললেন, আপনি আজকের পত্রিকা দেখেছেন।

পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী বললেন, আজ কত তারিখ?

–২৪শে জানুয়ারি।

–হে ভগবান। সময় কিভাবে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বুঝাই যায় না। পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কাল থেকেই তো নতুন বর্ষ শুরু হয়েছে। বিরাট এক পার্টি হয়েছিল। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন মিস মনচন্দা সুন্দর একটি শাড়ি পরে এসেছিলো।

উপমন্ত্রী তাঁকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, আজকে টাইমস পত্রিকায় একটি জরুরী খবর প্রকাশিত হয়েছে।

–'আমি শুধু ঐ সংবাদপত্রই পড়ি, যাতে আমার ভাষণ ছাপা হয়েছে। আজ দু'দিন যাবত কোন ভাষণ দেইনি। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট আর কী হতে পারে। মন্ত্রী সিগারেটে একটি লম্বা টান দিয়ে বললেন।

উপমন্ত্রী রিপোর্টটি পড়ে শোনান। জামনগর থেকে তিন মাইল দূরে অনিয়াবাদে কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে এক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই প্রকল্প যারা শুরু করছেন, তাঁরা কুকুরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে রুখতে আগ্রহী। কারণ এ প্রদেশের লোকজন কুকুরকে প্রাণে মারতে রাজী নয়। স্বাস্থ্য বিভাগ ভেটারনারী বিভাগের সাহায্যে এই প্রকল্প শুরু করবে। এই প্রকল্পের অধীনে সীমিত সংখ্যক কুকুরকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বন্ধ্যা করা হবে। পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী খবর শুনে বললেন, যত সব মূর্খ । মানুষের পরিবার পরিকল্পনা ঠিকভাবে হচ্ছে না, কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা কি করে হবে ? অযথা জনগণের টাকা নষ্ট হবে।

উপমন্ত্রী তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, অবশ্যই সঠিক কথা বলেছেন। আমিও তাই ভাবছিলাম। আমার মাথায় এই চিন্তা ভাবনা এসেছে কারণ আমাদের বিভাগে এখনও পরিবার পরিকল্পনা সফল হয়নি, কিন্তু নতুন বাজেট পাস হওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরও নতুনভাবে কাজকর্ম দেখানো দরকার। সে জন্যেই এ খবরকে আমি এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। উপমন্ত্রী আর কথা না বাড়িয়ে চুপ হয়ে গেলেন।

পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, প্রকল্পটি মন্দ নয়। আমাদের প্রদেশেও তো কুকুর আছে।

"অবশ্যই স্যার।" উপমন্ত্রী বললেন, আমি কোন কুকুরের ইন্টারভিউ নিইনি। মানুষের ইন্টারভিউ নিয়েই ফুরসৎ পাইনা। মুখ্য সচিবের সাথে আলাপ করবো, প্রকল্প অবশ্যই হবে।

পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী মুখ্যসচিবকে ফোন করে তাঁর ঘরে ডেকে আনলেন। মুখ্যসচিব রিপোর্ট পড়ে এবং পরিকল্পনা শুনে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। কোন সমস্যার উপর রায় দেয়ার আগে উনি চুপ করে থাকা পছন্দ করেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, কুকুরের সাথে আমার পরিচয় খুব বেশি নেই, কারণ ছোটবেলা থেকে টিয়া পাখি পোষার সখ ছিল। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে যুগ্ম সচিবের সাথে একটু পরামর্শ করলে মন্দ হয় না। তার বাড়িতে পাঁচটি কুকুর আছে।

যুগ্ম সচিবের কাছে যখন এই প্রস্তাব দেয়া হয়, তখন তিনি হতচকিয়ে গেলেন বললেন, স্যার আমার বাড়ির কুকুরগুলো খানদানী। এদের দেখাশুনার জন্য একজন কর্মচারী রেখেছি। আমার কুকুর সময়মতো খায়। সময় মতো ঘুমায়। সময় মতো সকালে জেগে উঠে, যথা সময়ে গোসল করে। সময় মতো বেড়াতে নেয়া হয়। ওদের আচার আচরণ একেবারে মানুষের মতো। এরকম খানদানী কুকুরদের পরিবার পরিকল্পনায় অনেক অর্থ ব্যয় হবে।

উপমন্ত্রী বললেন, ভাই, আমি বাড়ির পোষা কুকুরদের কথা বলছিনা। ওদের পরিবার পরিকল্পনার কোন দরকার নেই। তা মানুষ হোক বা কুকুর। ওরা যদি বাড়িতে বা বাংলোতে থাকে তবে ওদের পরিবার পরিকল্পনা আওতায় পড়বেনা। রাস্তাঘাটের কুকুরের কথা বলছিলাম। আমার প্রস্তাব সকল সাধারণ কুকুর সম্পর্কে।

যুগ্ম সচিব জবাব দিলেন, আমার মনে হয়, আন্ডার সেক্রেটারিকে ডাকা হোক। আমি তো সিভিল লাইনে থাকি। উনি শহরে থাকেন। রাস্তাঘাট আর বাজারের কুকুর সম্পর্কে তার ভাল ধারণা আছে।

আন্ডার সেক্রেটারি বৈঠকে এসে হাজির, প্রস্তাব শুনে তিনি উৎফুল্ল। কারণ জীবনে তিনি কুকুরকে দারুণ পিটুনি দিয়েছেন আর একবার শুধু এক হালুইকারের কুত্তা ওনার হাঁটুতে জোরে কামড় দিয়েছিল। এখনও দাগ আছে।

–তিনি বললেন, শহরে দু'লাখ কুকুর আর দু'লাখ কুকুরী আছে। যদি প্রত্যেক কুত্তি বছরে পাঁচটি করে বাচ্চা দেয়, তবে যদি তিন কুকুরের বাচ্চাও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে কুত্তার সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। স্যার, আমার ধারনা যদি এই হারে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুরের সংখ্যা বাড়ে তাহলে বছরে দ্বিগুণ হবে। দশ বছরের মধ্যে এই শহরে কুকুরের সংখ্যা জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। সে জন্য আমাদের এখনই জরুরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। একবার ভাবুন তো, এসব লাখ লাখ কুকুরের জন্য কত খাদ্যশস্য নষ্ট হচ্ছে। নানা অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। পথঘাট নোংরা হচ্ছে। কত মানুষ কুকুরের ছোয়াছে রোগে মারা যাচ্ছে।

স্যার কুকুর মানুষের বড় শত্রু। আমার ধারণা, যদি কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা করা যায়-তবে মানুষের আর পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে না।

মন্ত্রী মহোদয় হাততালি দিয়ে বললেন,বাহবা। আমিও তাই ভাবছিলাম। এই ভাবনাকে সফল করার জন্য আপনাদের বৈঠক ডেকেছি। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে–আপনাদের এখন যত শীঘ্রই সম্ভব কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা শুরু করতে হবে। আর এই মাত্র আমি যা বললাম, অর্থাৎ যদি কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা সফল করতে হয় তাহলে মানুষের আর পরিবার পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনারা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করুন। লিফলেটের কভার পৃষ্ঠার উপর আমার একটি ছবি ছাপাবেন। উপমন্ত্রী প্রস্তাব দিলেন, আর অন্য পৃষ্ঠায় কুকুরের ছবি।

উপমন্ত্রীর দিকে মন্ত্রীমহোদয় ফিরে তাকান আর সাথে সাথে বললেন, এর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আমার ছবি দিলেই চলবে।

মন্ত্রী ভাবতে ভাবতে বললেন, শুধু প্রচার পত্র প্রকাশ করলেই কাজ হবে না, এর জন্য নতুন স্টাফ লাগবে, বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। মানুষের পরিবার পরিকল্পনায় যারা কাজ করছে, কুকুরের পরিবার পরিকল্পনায় তারা কাজ করতে পারবেনা। কারণ মানুষ আর কুকুরের মধ্যে আচার আচরণে বিরাট পার্থক্য।

উপমন্ত্রী বললেন, এখন অবশ্য এ পার্থক্য নেই। দু'জনেই তার থেকে দুর্বলকে দেখলে ঘেউ ঘেউ করে। আর তার চেয়ে সবল দেখলে লেজ গুটিয়ে নেয়।

উপমন্ত্রী ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, না না এজন্য নতুন বাজেট তৈরি করতে হবে এবং নতুন স্টাফও রাখতে হবে। আর অত্যন্ত জরুরী বিষয় হল– এমন একজন ব্যক্তিকে এই প্রকল্পের ইনচার্জ করতে হবে যে কুকুর সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে।

আন্ডার সেক্রেটারি বললেন, আমার এক ভাইপো আছে।

যুগ্ম-সচিব বললেন, আমার এক ভাগ্নে আছে।

চীফ সেক্রেটারি বললেন, আমার এক নাতি আছে।

মন্ত্রী বললেন, আমার এক জামাই আছে। বৈঠকে আর কেউ উচ্চবাচ্য করলেন না, মন্ত্রী সর্বদা সত্যবাক্য উচ্চারণ করেন এবং সর্বশেষে সেটাই সকলে মেনে নেন। তার পরের দিন থেকে আমাকে চাকরিতে নিয়োগ করা হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুষ্ট লোকেরা রটিয়েছে, মন্ত্রীর জামাই তাই আমার এই চাকরি হয়েছে। কিন্তু এই কাজের জন্য আমিই ছিলাম উপযুক্ত প্রার্থী। প্রথমতঃ আমি পশু ডাক্তার। পশুর মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান ও ধারণা আছে, আর কারও নেই। তাছাড়া আমি পশুদের ভাষাও জানি। কুকুর, বানর থেকে শুরু করে মশা এবং মাছির বুলিও আমি বুঝতে পারি। আর এ যুগে যেখানে ছেলে বাবার কথা বুঝতে পারেনা, আপনারা নিশ্চয়ই আমার কাজ কতো কঠিন তা বুঝতেই পারেন।

দুইজন আর্দালী, দুইজন খালাসি, দুইজন কম্পাউন্ডার এবং একটি ভ্রাম্যমান গাড়ি নিয়ে গলির মুখে এক কুত্তাকে পাকড়াও করলাম। কুকুরটি এক কুকুরণীর পেছনে ছুটছিল।

কুকুরটি আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। বুঝতে পারল, আমি একমাত্র তার ভাষা বুঝতে পারি। কুকুরটি আমাকে বলল, "তুমি কি চাও?"

আমি তাকে বললাম, তোমাকে অপারেশন করবো।

— কেন?

— যাতে তুমি বাচ্চা পয়দা করতে না পার।

কুকুরটি বলল, আমি বাচ্চা পয়দা করলে তোমার কি?

আমি বললাম, ওদের জন্যে আমরা খাদ্য পাব কোথা থেকে ? দেখ এই শহরে দু'লাখ কুকুর আছে। আগামী পাঁচ বছরে দু'লাখ কুকুর দশলাখে উন্নীত হবে। বল, এই দশ লাখ কুকুরের খাবার আমরা কোথা থেকে সংগ্রহ করবো? নিজেদের সন্তান-সন্ততির পেটই আমরা ভরাতে পারছিনা। তাই তোমাদের পরিবার পরিকল্পনা খুবই দরকার।

কুকুর জবাব দিল, তবে অপারেশন কর। আমি তোমাকে নিষেধ করবো না। যদি আমাদের বংশ ধ্বংস করে মানুষ নিরাপদে থাকে তাহলে মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবো। তুমি অযথা এই ঝামেলা করছ। কুকুরদের খতম করে তোমাদের কোন লাভ হবেনা।

–কেন?

কুকুরের সংখ্যা কমালে বিড়ালের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, বিড়াল কত তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয়। আর আমরা তো নিছক কুকুরই। তোমাদের খাবারের ঝুটা খেয়ে দিন কাটাই। বিড়াল তো সরাসরি তোমাদের পাকঘরে ঢুকে দুধ খেয়ে পালিয়ে যায়। একথা কি জান?

কুকুর খুব সঙ্গত কথাই বলেছে। আমি যখন অফিসারদের কুকুরের ভাষ্য শুনালাম। তখন তারা শলাপরামর্শ করে রায় দিলেন কুকুর সঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা বন্ধ রেখে বিড়ালের উপর হামলা চালাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। আমাকে নতুন অর্ডার আর নতুন স্টাফ দেয়া হল। নতুন বাজেট তৈরি হল এবং প্রচার পত্র বিলি করা হল। এর নাম "বিড়ালের পরিবার পরিকল্পনা।"

আট-দশদিন চেষ্টা-চরিত্র করার পর একটি নাদুস-নুদুস বিড়ালকে ধরে ফেললাম। আমাকে দেখে বিড়ালটি গরগর করতে থাকে বলল, কি মহাশয়, আমাকে চেনেন নাকি? শিক্ষামন্ত্রীর পোষা বিড়াল আমার বেগম। চাকরি খোয়াবার ইচ্ছা না থাকলে এখনই ছেড়ে দাও নচেৎ, অভিযোগ করবো।

আমার খুব রাগ হল, বললাম, তুমি কি ভেবেছ তোমার বৌ মন্ত্রীর বিড়াল হলে, আমি কিন্তু মন্ত্রীর জামাই। আমি এত দুর্বল নই যে তোমার কথায় ভয় পাব।

আমার উত্তর শুনে বেটা বিড়ালটা দমে গেল। আমাকে বলল, তুমি কি চাও বল।

আমি তাকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললাম। সে পরিকল্পনা শুনে বলল, তাহলে তোমরা মানুষের পরিবার পরিকল্পনা আর কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এখন বিড়ালের প্রকল্প নিয়েছে। যাতে আমাদের বাচ্চারা তোমাদের খাবার খেয়ে ফেলতে না পারে।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। আমাদের পরিকল্পনাও তাই। আমি বিড়ালটাকে বুঝাতে লাগলাম। আমরা তোমার জান নেবনা, শুধু অপারেশন করবো। অপারেশনে তোমার মাত্র দু'মিনিট কষ্ট হবে। এরপর আট দশ দিন ধরে তোমাকে প্রতিদিন বাসি-মুখে নাস্তার আগে একটি করে বড়ি খেতে হবে।

বিড়াল বলল, খুব ভালো কথা। মানুষের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার জন্য আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে প্রস্তুত। কিন্তু মনে রাখবে, তোমরা যদি আমার বংশ শেষ কর, তবে তোমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতও আগের চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভোগে পড়তে হবে।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, বিড়ালকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি করবো?

বিড়াল বলল, আরে মূর্খ, ভাবছ কেন এ পৃথিবীতে বিড়াল যদি না থাকে তবে ইঁদুরের কী হবে। আজও মানুষের খাদ্য চারভাগের এক ভাগ ইঁদুর খেয়ে ফেলবে। আর এর পরিবর্তে তারা তোমাদের কি দেয়? প্লেগ আর নানা অসুখ বিসুখ। এ বিষয়টি ভেবে দেখো। যদি এই শহরে বিড়াল না থাকে, তাহলে এক বছরে এক কোটি ইঁদুর বেড়ে যাবে।

আমি তার কথা শুনে বললাম, আরে তুমি তো ঠিকই বলেছ।

"তোমরা যদি পশুর পরিবার পরিকল্পনা চালু করতে চাও। তবে প্রথমে ইঁদুর দিয়েই শুরু করো। বিড়াল আমাকে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এই বুদ্ধিমান বিড়ালের কথা মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বললাম। শোনার সাথে সাথে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন, সত্যিই আমি নিজেই তা ভাবছিলাম।

সুতরাং আমরা আবার পরিকল্পনা পাঠালাম। আবার নতুন স্টাফ রাখা হল, নতুন বাজেট পাস হল এবং নতুন প্রচারপত্র ছাপা হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এবার আমরা সম্পূর্ণ সঠিক রাস্তায় যাচ্ছি। এখন সমস্ত কাজ পরিকল্পনা অনুসারে দ্রুত শেষ করতে হবে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারলাম, কাজ তত সহজে নয়। প্রথমে কর্পোরেশনের সাথে আমাদের বিবাদ বাধানো। যখন আমাদের স্টাফ অপারেশনের জন্য ইঁদুর ধরতে গেল, তখন আমরা বুঝতে পারলাম শহরের সমস্ত ইঁদুর কর্পোরেশনের সম্পদ। এর উপর আমাদের কোন দাবি নেই। কর্পোরেশন যতক্ষণ নির্দেশ না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী আমরা একটি ইঁদুরকেও অপারেশন করতে পারবোনা। আমরা রাগান্বিত হলাম। আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে একটি চিঠি দিলেন। এভাবে কয়েকমাস কেটে গেল। কর্পোরেশনের লোকেরা শহরের ইঁদুর আমাদের হেফাজতে দিতে রাজী নয়। ওরা ইঁদুরগুলোকে একেবারে মেরে ফেলতে চাচ্ছিল– যা এতদিন ধরে চলে আসছে। আর আমরা– পরিবার পরিকল্পনার লোকেরা ইঁদুরদের জানে না মেরে অপারেশন করতে চাইছিলাম। যাতে আর ইঁদুর পয়দা না হয় এবং আমাদের পরিকল্পনাও সফল হয়।

দেড় বছর ধরে এই ঝগড়া চলল। অবশেষে উপর থেকে নির্দেশ এল। প্রথমে কর্পোরেশন ইঁদুরগুলোকে মেরে ফেলবে। তারপর আমাদের হাতে তুলে দেবে। যাতে আমরা তাদের অপারেশন করতে পারি। উপর ওয়ালা দু'পক্ষেরই কথা রেখেছে। কিন্তু মরা ইঁদুর অপারেশন করা বৃথা। আর আমাদের পরিকল্পনাও খুব ঝামেলায় পড়তো। তাই মন্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, বাবাজী, ঝগড়া করে কি লাভ? শহরের মেয়র আমাদের নিজেদের লোক। এটা ওনার মান-সম্মানের ব্যাপার। শহরের ইঁদুর যদি উনি নিজের কাছে রাখতে চান, তবে রেখে দিন। তুমি গ্রামে যাও। শুনেছি গ্রামে অনেক ইঁদুর।

আমি বললাম, অবশ্যই, থাকা উচিত। কিন্তু শহরের ইঁদুর থেকে ডবল, বড়সর, এর জন্য আরও স্টাফ লাগবে।

–আরও স্টাফ নিয়ে যাও।

–গ্রামে যেতে দুটো জীপ লাগবে।

–দুটো জীপ নিয়ে যাও। কিন্তু এখন শহরের ইঁদুরের কথা ছেড়ে দাও, গ্রামের ইঁদুরের দিকে নজর দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, শহরের ইঁদুর খুব ভদ্র। পরিবার পরিকল্পনার কথা সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু এই গেঁয়ো ইঁদুরদের বোঝানোর জন্যে আমার অনেক বেশি প্রচার চালাতে হবে। মন্ত্রী অত্যন্ত আদরের সাথে বললেন, নতুন আর একটা প্রচার পত্র তুমি ছাপাও। এখন আমার একটা নতুন ছবি এসেছে।

একদিন যখন সব কিছু সংগৃহীত হল, তখন আমরা পেরেক আর কাঁটা নিয়ে ইঁদুরের পরিবার পরিকল্পনা শুরু করার জন্য গ্রামে গেলাম। কিন্তু গ্রামের লোকজন আমাদের প্রবেশ পথে আটকে দিল। রাস্তার মাঝখানে লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের ঘেরাও করলো।

ওদের সর্দার বলল, "ইঁদুরের পরিবার পরিকল্পনা। কী বোকা। জাননা, ইঁদুর যদি আমাদের ক্ষেতে না থাকতো তাহলে ক্ষেতের অর্ধেক শস্য পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলতো? ইঁদুর তো দিন রাত পোকা মাকড় খেয়ে আমাদের ফসল রক্ষা করে। আমরা ওদের পরিবার পরিকল্পনা হতে দেবনা। কোন মতেই না। এখান থেকে আপনারা চলে যান।"

আমি নিজের মনে মনে বললাম, "কী অদ্ভুত সমস্যা। আমরা কুকুরের পরিবার পরিকল্পনা করতে গেলে, বেড়ালের সংখ্যা বেড়ে যায়। বেড়ালের যদি পরিবার পরিকল্পনা করি তাহলে ইঁদুর বেড়ে যায়। আর ইঁদুর শেষ করলে পোকা-মাকড় বৃদ্ধি পাবে। এখন কী করা যায়?

আমরা গ্রাম থেকে পালিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু কারো ভয়ে কী সরকারী পরিবার পরিকল্পনা বন্ধ থাকতে পারে। এতো সরকারী কাজ, সরকারী কাজ হামেশাই চলতে থাকে। এক পরিকল্পনা সফল না হলে তার জায়গায় আর এক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হবে।

শুনেছি আমাদের বিভাগ থেকে খুব শীঘ্রই পোকা-মাকড়ের পরিবার পরিকল্পনার কাজ শুরু করবে। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় বাধা হল আমাদের পরিকল্পনা বিরোধীরা। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে লেগেছে। কৃষি বিভাগ এক জোরালো প্রতিবাদ নোট পাঠিয়েছে। রেশম দপ্তর পোকার পরিবার পরিকল্পনা করতে রাজী নয়। বহু সরকারী অফিসার এই প্রতিবাদ নোটকে স্বাগত জানিয়েছে। বোধ হয়, এই ভেবেই অভিনন্দন জানিয়েছেন যে সরকারী কর্মকর্তারা এক ধরনের রেশম পোকা।

কিন্তু কারো ভয়ে বা চাপে আমাদের পরিবার পরিকল্পনার কাজ বন্ধ থাকতে পারবে না। নতুন প্রচার পত্র ছাপা হচ্ছে। নতুন বাজেট পাস হয়েছে। নতুন স্টাফ রাখা হয়েছে। আর আমিও এ বছর নিজের বেতন বাড়িয়ে নিয়েছি– কারণ আমার ঘরে সুদিন আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# সামনে প্রদীপ

[কৃষণ চন্দরের 'অন্নদাতা' উপন্যাস ১৯৪২ সালের বাংলার মন্বন্তরের উপর ভিত্তি করে রচিত। অন্নদাতা উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে 'মুবি' তৃতীয় অধ্যায়ে ভগতরাম অধ্যায়ের শেষ অংশ শমাকে সামনে। আলোচ্য রচনাটি রোমান্টিকতায় ভরপুর।]

আমার গ্রাম তখনও দশমাইল দূরে। বেলা দুপুর গড়িয়েছে। খচ্ছরের চলার গতি থেমে গেছে। পাহাড়ের উপত্যকায় বুলবুলি গাছের ডালে বসে মধুর সুরে গান গাচ্ছে। সে জানে না দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা সমাগত। বাতাসের দুলায় দুল খেয়ে গাছের বুলবুলি আনন্দে গান গায় আর তার ধারণা হয়তো প্রিয়তমা এখনি এসে পড়বে। সন্ধ্যা সমাগত, প্রিয়তমার আগমন আসন্ন। কিন্তু আমার গ্রাম তো দশমাইল দূরে। খচ্ছরটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির খচ্ছরটি বার বার কান দোলাচ্ছে আর থেমে যাচ্ছে। নাকের ডগা ফুলিয়ে ফুস-ফুস শব্দ করছে আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। হয়তো কোথাও গন্তব্য স্থানের দেখা মিলতে পারে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে যেখানে গিরিপথের শেষ প্রান্তে রজ্জুর তৈরি পুল। পাহাড়ী ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে এখানে এসে আমার খচ্ছর থেমে যায়। অনেক চেষ্টার পরও সে এক পাও নড়েনি। কোন উপায় না দেখে আমি নেমে পড়ি। লাগাম ধরে টেনে নিয়ে পাথরের আড়ালে নিয়ে যাই। একটি গাছের সাথে বাঁধার পর আমি থলে থেকে ভুট্টার রুটি ও শাক বের করি। তখন কিন্তু কাঁচা মরিচ আর সামান্য চাটনি হলে মন্দ হতো না।

এই পথে কাজে কর্মে আরও দু'একবার গেছি। পাহাড়ী উপত্যকার ঢালুতে ধানের ক্ষেতের মাঠ অনেক দূর বিস্তৃত। ধান ক্ষেতের পর চমন কোর্টের গ্রাম। চমন কোর্ট এলাকায় আমার মামা আল্লাদাদ খানের বাড়ি। সমগ্র এলাকায় ডাকাতির জন্য তার বেশ খ্যাতি ছিল। আমার বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারি তিনিই একমাত্র তাঁর বিরোধিতা করতেন। অবশ্য আমাদের রংপুর গ্রামের অধিবাসীরা ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমি কখনও চমনকোর্টে মামার বাড়িতে থাকা সমীচীন মনে করতাম না। তখন বিকেলবেলা বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি যেভাবে হোক নিজবাড়িতে চলে যেতে চাই। আমার থলে ভর্তি সরকারি রাজস্ব আদায়ের টাকা হাতে বন্দুক কোমরে কার্তুজ। আমার নিশানা অনেক দূরে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম। কিন্তু তবুও রাতে সেখানে অবস্থান করতে আমার মন সায় দেয়নি। খচ্ছর যদি বিরক্ত করে চলতে না চায় তবে তাকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাব। আহার শেষে আমি খচ্ছরটির দিকে তাকাই; আর তাকে সামনে এগিয়ে যেতে ইশারা করি। আমি পাহাড়ী ফোয়ারার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে মুখ দিয়ে পানি খেতে থাকি। পাশে দেখি আমার খচ্ছরও পানি পান করছে আর আমি তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গরম হাওয়া আমি উপলব্ধি করতে পারছিলাম- তাতে ভেসে আসছিল ঘাস ও ছোলার গন্ধ। আমি খচ্ছরের মুখটা দূরে ঠেলে দিই, আরে ভাই এটা কি ধরনের ভালবাসা?

"এগুলি বন্য-প্রাণীর জন্য নয়?" পেছন থেকে কে জানি বলল। পিছনে ফিরে দেখি দু'জন তরুণী কলসী কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই যুবতী। এদের মাঝে হয়তো একজন উপরোক্ত কথাটি বলেছে। সুন্দরী মেয়ে দু'জন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। ডাগর ডাগর কালো চোখ। একজনের গালে হাসলে টোল পড়ে অপরটির মুখমন্ডল গোলাকার। পা-জোড়া দু'জনেরই খালি। পরনে কালো রঙের কামিজ। হাত-পা ও চেহারা দেখে মনে হয় দু'জনেই কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। যৌবন শেষ হলে হাত-পায়ের দেহের চামড়া ঝুলে পড়বে আর নাসপাতির ন্যায় পাকা গোলাপী রঙের চামড়ায় ছুরির কাটায় ন্যায় দাগও পড়বে আর চেহারার জৌলুস উবে যাবে। হায়, কিন্তু এখনতো যৌবনের দাপট তাদের দেহের ভাঁজে ভাঁজে মুচকি হাসির নিচে যৌবন যেন কাঁপছে।

আমি বিস্মিত নেত্রে তাদের দিকে তাকাই। ওরা নতশীরে বলল, "এগুলি বন্য-প্রাণীদের জন্য নয়।"

আমি জবাব দিই "প্রত্যেক মানুষ বই জানোয়ার। তাই পানি পান করে। মানুষ হোক বা খচ্ছর। পান করে যাও।" একথা বলে আমি খচ্ছরটির মুখে ধরে জোর পূর্বক পানি খাওয়াতে থাকি।

একটি মেয়ের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দড়ি ধরে খচ্ছরটিকে হেচকা টান দেয়। খচ্ছরটি লাফাতে শুরু করলে পায়ের আঘাতে তার কলসী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

আমি হাসতে থাকি। অপর মেয়েটি যার তুলনা একমাত্র নাসপাতির সাথে চলে, খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে। "এতে হাসির কি আছে, ময়না।" প্রথম মেয়েটি রেগে বলল, তারপর তড়িৎ বান্ধবীর হাত থেকে কলসীটি কেড়ে নিয়ে নদীতে ছুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে দেয়। নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কলসী অনেকদূর চলে গেছে। আমি নদীর ঢেউ এ ভেসে যাওয়া কলসীটির দৃশ্য দেখছিলাম। একটি বিরাট ঢেউ-এর আঘাতে কলসীটি তীরে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে ডুবে যায়। আমি হাতের ইঙ্গিতে কলসীটি ডুবে যাওয়ার দৃশ্য ওদেরকে দেখাচ্ছিলাম। প্রথম মেয়েটি দাঁত খিটমিট করে বলল, "হাসছো কেন?"

জবাবে আমি বললাম, "যখন দু'টি জানোয়ার লড়াই করে তখন কলসী ভেঙ্গে যায়।

সে বলল, "জানোয়ার তুমি, অসভ্য শূকর কোথাকার! বন্য পরিবেশই নষ্ট করে দিলে। প্রথমতঃ খচ্ছরকে পানি খাওয়ালে তারপর আমাদের কলসী ভেঙ্গে দিলে। এখন ওলটপালট বকাবকি করছো তাইনা। পয়সা বের করো নইলে ...।"

"না হলে কি হবে?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি তোমার খচ্ছর নিয়ে যাব।" একথা বলার পর সে লাফিয়ে আমার খচ্ছরটির লাগাম ধরে চোখের পলকে খচ্ছরের পিঠে চড়ে পালিয়ে যায়। তার বান্ধবী মর্জিনা পিছু পিছু দৌড়ে তাকে অনুসরণ করছিল। আমি বন্দুক উচিয়ে বললাম, আমি গুলি চালাব। কিন্তু কি করব মেয়েদের গায়ে হাত উঠানো সহজ নয়।

"শুন আরে শুন। এই নাও পয়সা। আল্লাহ্‌র দোহাই। আজই আমাকে রংপুর যেতে হবে।"

অসভ্য মেয়েটি কোন কথা কানে নেয়নি। খচ্ছরটি যেখানে এক কদমও নড়তে চাইতোনা পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মর্জিনা লাগাম ধরে বসেছিল আর অপর মেয়েটি পেছন ফিরে আমার দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল। থামো শূকরের ছানা, দেখো আজ রাতেই তোমাকে বিয়ে করে ছাড়ব নচেৎ আমার নাম শাহজামান নয়। পাহাড়ী জঙ্গল ও নদীর ধার দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছিল ওরা। কাঁধে বন্দুক আর কার্তুজের বোঝা নচেৎ অনেক আগেই ওদের গিয়ে পাকড়াও করতে পারতাম। দৌড়াতে দৌড়াতে আমি হাফিয়ে উঠেছিলাম তাই একখানে থেমে গেলাম। আর চীৎকার করে বললাম ডাকুর মেয়েরা একটু থামো। খচ্ছরটি তাদের সঙ্গী। নচেৎ গুলী করতাম। অসভ্যরা আমার হুমকি শুনে একটু ফিরেও তাকাল না বরং খচ্ছরটিকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। আর পালাচ্ছিল সজোরে। আমি একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের পালানোর দৃশ্য দেখছিলাম। উপত্যকার মাঝে প্রবাহিত ছোট্ট নদীটির ঘাটের দিকে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। নদীর ঘাটের কাছেই গাছের ছায়ায় কয়েকটি তাঁবু দেখা যাচ্ছিল, নিশ্চয় এই তাঁবুগুলি যাযাবরদের আস্তানা। তাঁবুর মাঝখানে আগুন জ্বলছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আগুনের ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উর্ধ্বে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। খচ্ছর আরোহী মহিলা মর্জিনাকে আমি সেই তাঁবুগুলির কাছে নামতে দেখেছি আর দু'জনেই একটি তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। খচ্ছরটি বাইরে ঘাস খাচ্ছে। তাঁবুর ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসে আর আমার দিকে একবার তাকিয়ে খচ্ছরটিকে একটি খুঁটিতে বেঁধে তাঁবুর ভেতর চলে যায়। আমি ভাবলাম, এবার যাযাবরদের সাথে ঝামেলায় পড়তে হবে। আবার ভাবলাম আমার মামা আল্লাদাদ খানের সাহায্য নিলে মন্দ হয়না। আবার ভাবি আমার থলেতে খাজনা আদায়ের সরকারি টাকা রয়েছে আল্লাদাদ খান এক ডাকাত আমার টাকাগুলি কেড়ে নেয়। এখন একাই আমাকে যাযাবরদের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। অবশ্য এই বারো বোরের বন্দুক তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট। আমি এরপর নিচে নামতে থাকি। কারণ চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে উপত্যকায় চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছিল। আমি যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে উপত্যকায় নেমে এসেছি চারিদিকে অন্ধকার নেমে পড়েছে। তাঁবুর মাঝখানে আগুন জ্বলছিল আর আমার খচ্ছরটি পাশে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে। খচ্ছরটি আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ভয় পেয়োনা বন্ধু তোমাকে অত্যাচারীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। আমি মনে মনে বললাম। আমি এগিয়ে যেতেই একজন হাক দিল "কে ওখানে?"

"আমি একজন মানুষ।" আমার উত্তর। "মানুষ না জন্তু।" লোকটি আবার বলল। এবার দু'হাত বুকে জোড় করে উঠে দাঁড়ায় তার চোখে মুখে আগুনের ঝলক যেন বার বার আলোকিত করছে।

"শামা ভেতরে যাও।" লোকটি বলল।

"আমিই তার সাথে বোঝাপড়া করব।"

আমি বললাম, "আমি ঝগড়া করতে আসিনি। তোমার স্ত্রী আমার খচ্ছর চুরি করে এনেছে। আমি সেটা ফেরত চাই।

সে জবাব দেয়, আমার বোনকে স্ত্রী বানাচ্ছ কেন পথিক?

"আমি বললাম, সে যেই হোক তোমার স্ত্রী বা বোন অথবা মা তাতে আমার কিছু আসে যায়না । আমার খচ্ছরটা ফেরত চাই।"

"তোমার মা কি শূকরের বাচ্চা।" সে আবার চীৎকার করে তাঁবুর বাইরে চলে আসে।

"শামা তুমি চুপ করো, পথিকের সাথে আমাকে আলাপ করতে দাও।"

সে ভেতরে চলে যায়। লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার বাড়ি কোথায়?"

"রংপুর"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নাম কি?

শাহজামান।

"কি কাজ করো?"

আমি জমিদারের ছেলে।

লোকটি বলল, "আমি জানতে চাইলাম তুমি কি করো আর কিনা তুমি জবাব দিচ্ছ আমি জমিদার তনয়।"

আমি বললাম, "শিকার করা প্রেম করা আর মাঝে মাঝে বাবার পক্ষে খাজনা আদায় করা আমার কাজ। এবার আমার খচ্ছর ফিরিয়ে দাও, "একথা বলার পর আমি এগিয়ে গেলাম।

সে বলল, "দু'তিনদিন পর আমি রংপুর যাব। সেখানে কি কাজ পাওয়া যাবে।"

আমি জবাব দিলাম তোমরা ভবঘুরে যাযাবর শুধু কাজে ফাঁকি দাও। আর সারাদিন ঘুরে বেড়াও। আবার চাষীদের ভেড়া ছাগল চুরি করো। তোমাদের চলে যাওয়ার পর জানা যায়, অমুক চাষীর চাষের বলদ চুরি গেছে। কারও মুরগী চুরি গেছে কারও বা গাধা কারও কারও ছাগল লাপাত্তা।"

সে বলল "এতো মামুলী ব্যাপার। তোমরা হলে জমিনের মালিক। এসব ছোট খাটো ব্যাপারে তোমাদের মনযোগ না দেওয়াই ভাল।

ফাতেমার দিকে তাকাল মাহবুব তার কথায় দারুণ নম্রতা। সে বলল, আমার কাজের দারুণ প্রয়োজন।

চ্যামন কোর্ট তোমার পছন্দ হয় না।

"জায়গা ভাল তবে ডাকাতের আড্ডা। আমাকে অনেকে ধমক দেয় ভয় দেখায়। না জানি কোনদিন খুন-খারাবি হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ সে নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি দেখলাম হাতে একটি বন্দুক।"

সে বলল, তুমি তোমার খচ্ছর নিয়ে যাও। আমার বোন বোকা। আগন্তুকের সাথে কেন ঝগড়া করতে যাবে। ওরা ওতো তোমাদের মতো ভবঘুরে। অবশ্য কিছুদিনের জন্য। একথা বলার পর সে হাসতে থাকে আর তার হাসি ছিল আকর্ষণীয়। পাশের একটি তাঁবু থেকে একজন বৃদ্ধা এক যুবতী, দুইটি শিশু এবং এক অঢের বয়সী লোককে দেখা যাচ্ছে। ওরা সবায় খেতে বসেছিল। বুড়ী হাঁড়ির ভেতরে কাঠের চামচ দিয়ে বার বার ঝোল বের করে সবার পাতে দিচ্ছিল। রান্নার ঝোলের সুগন্ধি বাইরে এসে আমার নাকে লাগছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে তাকাতেই আমার চোখাচোখি হয়। তারপর আমার চেহারা ছুরত পর্যবেক্ষণ করে বলল, এসো আজ রাতে আমাদের সাথেই থাকবে। সামনে গভীর জঙ্গল বিপজ্জনক রাতে কিভাবে একা যাবে?

আমি জবাব দিলাম, একা নই দু'নালা বন্দুক আমার সঙ্গে আছে।

এই দু'নালা বন্দুকের উপর তোমার দারুণ আস্থা। মাঝে মাঝে এটাকে ব্যবহারও করে থাকো। আবার সে হাসতে থাকে। তার হাসি ছিল অত্যন্ত মনোরম। আমি ব্যঙ্গাত্মক বাক্যবারণ নিক্ষেপ সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দিই এবং তার পিছু পিছু তাঁবুতে প্রবেশ করি।

মাটি খুঁড়ে উনোন তৈরি করা হয়েছে। উনোনে হাড়িতে তরকারী ফুটছে আর মর্জিনা পাশে বসে চামচ দিয়ে হাড়িতে নাড়ছে আর আগুনের জ্বাল কমিয়ে দিচ্ছিল। শামা মাথা নিচু করে জবের আটা মাখছিল। উনোনের আগুনের আলোর ঝলক তার মুখে ও চুলে মাঝে মাঝে আলোকময় করে তুলছিল।

মর্জিনার চোখ-মুখে বিস্ময় আর শামার চোখে হতাশা। এই তাঁবুগুলি পুরনো ছাতার কাপড় রংবেরং-এর কাপড়ের টুকরো আর গমের খোসা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দেখতে ঠুনকো আসলে বেশ মজবুত। এক কোণায় ময়লা কাপড় জড়ানো একটি ছাগল বাঁধা। একটি কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠে। "চুপ করো বর্বর"পুরুষের ধমকে কুকুরটি চুপ হয়ে যায়। সাদা রঙের কুকুরটির চোখ জোড়া জবা ফুলের ন্যায় লাল। কুকুরটির নাম পাপা।

আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম কি? "আমার নাম খোদাদাদ।" ছোট্ট উত্তর।

আমি বললাম "তুমি বোনের বিয়ে দাওনা কেন? স্বামীর হাতে মার না খেলে সে সোজা হবে না।"

লোকটা হাসতে থাকে, একজন স্বামী জুটলে তো যে তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে।

আমি বললাম, আমার সাথে বিয়ে দাও। আমি পিটিয়ে তার গায়ের চামড়া তুলে না নিলে আমার নাম শাহ জামান ।

শামা বিদ্যুতের ন্যায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ভাইয়ের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে বলল, হাত দিয়ে দেখো গায়ে। আগন্তুক তুমি নচেৎ অন্য কেউ হলে এই বন্দুকের গুলি হৃৎপিন্ড ভেদ করে পার হয়ে যেতো।

খোদাদাদ মুচকি হেসে বলল, শামা ঠিকই বলেছে, তার লক্ষ্য অব্যর্থ।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "আমিও তার একজন অনুরাগী।" একথা শোনার পর সে দ্রুত মর্জিনার কাছে গিয়ে বসে পড়ে। মর্জিনার ডাগর ডাগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখজোড়া এক নাগাড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। শামা ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। আবার সে উনোনে ভূট্টোর আটা দিয়ে রুটি তৈরি করতে থাকে। গরম গরম রুটি থেকে সবুজ ভুট্টা ও গমের গন্ধ ভেসে আসছিল। তাঁবুর একটা শিশু কেঁদে উঠে আর ছেলেটার মা তাকে তিরস্কার করছিল। বাবা চরকী চালিয়ে কাঁচি-ধার করছিল চীৎকার করে ওঠে, চুপ করো শয়তানের বাচ্চা, নচেৎ এই কাঁচি পেটে ঢুকিয়ে দেব। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে জবাব দেয়, "শয়তানের বংশধর তুমি বাবা।" বাবা মুচকি হাসে আর দা ধারালো করতে থাকে।

"খোদাদাদ।" ডাক পড়ে।

"কে ওখানে, রাবেল।"

"হাঁ।"

"কি বলতে চাও বল।

"আজ কি তাঁবুর বাইরে আসবে না, এত সুন্দর চাঁদনী রাত।"

"আমরা তাঁবুর পর্দা বন্ধ করে রশি বাঁধছি। আমি ও মর্জিনা। শনের খোসা ভিজিয়ে রশি তৈরি করি। শামা রশির এক কোণা পায়ের আঙ্গুলের সাথে জড়িয়ে চেপে ধরে রেখেছে অপর দিকে খোদাদাদ দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শামা পায়ে জড়ানো দড়িতে একটুও টান পড়েনি। তার চেহারা রক্তিম আকার ধারণ করেছে আর চোখের পাতা বুজে আসছিল। সে তাকে বার বার সামলে নিচ্ছিল। নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হয়েছে। মাঝে মাঝে সে পাতলা ঠোঁটে জিহবা বের করে বুলিয়ে নিচ্ছিল। এই দৃশ্য আমার বেশ ভাল লেগেছে।

রাবেলের ডাকে খোদাদাদ উঠে দাঁড়ায় আর তাঁবুর পর্দা খুলে বাইরে চলে আসে। বাইরে এসে সে প্রাণ খুলে নিশ্বাস নেয় যেন চাঁদনীর আলো শুকে দেখছে। পর্দা তোলার ফলে চাঁদের আলো তাঁবুর ভেতর বসে থাকা শামার চোখে-মুখে পড়ে আর তা তাঁবুর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। চোখাচোখি হতেই তার দৃষ্টি নত হয়ে পড়ে আর তার চোখের পলকে চাঁদের আলো যেন নেচে বেড়াচ্ছে। শামার যৌবন আর চাঁদের আলোর মিশ্রণে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। পরমুহূর্তে খোদাদাদের ডাকে আমার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। সে বলছিল, শাহ জামান বাইরে চলে এসো শামা-মর্জিনা। শামা তার ভাইয়ের কার্তুজভরা বন্দুক আর আমি দু'নালা বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে আসি। আমি ব্যাপার কি জানতে চাইলে সে বলল, "তোমার পৌরুষত্বের পরীক্ষা নিতে চাই।"

বাইরে রাবেল দাঁড়িয়ে। ছ'ফুট দৈর্ঘ দেহের অধিকারী রাবেলের স্যালোয়ার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা খালি। পায়ের গোড়লিতে জখমের চিহ্ন। মাথায় ঝাকড়া চুল তার উপর বাগদাদের চোরের ন্যায় রুমাল বেঁধে রেখেছে। ডান কানে একটি লোহার কর্ণফুল। যাযাবর তো নয় যেন কোন ছবির হিরো। সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে আর শামার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

রাবেল বলল, "খোদাদাদ বলেছে তোমার কাছে ইংরেজী বন্দুক আছে।"

শামা চীৎকার করে ওঠে, "হাঁ এই দেখো পথিকের হাতে বন্দুক।"

রাবেল সেটাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে তারপর বলল, এটা কেমন বন্দুক একটি নালীতে দাঁত আছে অপরটি ফাঁকা, আমাদের টোটা ভরা বন্দুকের মতো।

আমি জবাব দিলাম, দাঁতাল নলীতে আমি বড় শিকারের জন্য গুলী ভর্তি করি আর সোজা নলীতে পাখি শিকার করি। এটা গুলীভরা কার্তুজ- এটা ছররা দেখো ।

রাবেল বলল, বিদেশী রাইফেল এই জাতীয় হয়ে থাকে তবে আমাদের টোটা বন্দুকের সাথে মোকাবিলা করতে পারে না।

শামা বলল, বন্দুক ভাল মনে হতে পারে না। আসলে শিকারীর হাতের উপর সব নির্ভর করে।

রাবেল হাসতে থাকে। তার হাসি আমার কাছে মিছরি মনে হয়। আমি বললাম জওয়ান শিকারীর হাত কেমন সেটাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো। কে তোমাকে বাঁধা দেবে?

রাবেল এগিয়ে যায়। খোদাদাদের চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। রাবেল আমার দিকেই আসছিল।

খোদাদাদ ধীরকণ্ঠে বলল, "শাহজামান আমার অতিথি।" রাবেল থেমে যায় আর পেছনে চলে আসে।

খোদাদাদ বলল, সামনে দেখো দেয়ালের গুলীর দাগ। সেখানে একটি খুঁটি সেটা আমাদের নিশানা।

চাঁদনী রাত দেওয়ালের খুঁটকে ফাঁসি কাষ্ঠের ন্যায় মনে হয় আর তা সোজা আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

শামা বন্দুক আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলল, তুমি আমাদের অতিথি। তোমার পালা সবার আগে। তার কথার মাঝে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছিল। আমি বন্দুক চালিয়ে দেখি দেওয়ালের খুঁটিটির কিছুই হয়নি। আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। খোদাদাদ একবার লক্ষ্যবস্তুকে দেখে নিল, তার বন্দুক উঁচিয়ে ফায়ার করে। কিন্তু খুঁটি যথাস্থানে দাঁড়িয়েছিল রাবেল হাসতে থাকে। এবারে রাবেল ধীরে-সুস্থে বন্দুক হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ফায়ার করে। পুর্লি খুঁটি দেওয়াল ক্রেন পাখির পালক থাকলে তাও ভেদ করে চলে তাতো এমন একটা ভাব। কিন্তু খুঁটি যথারীতি খাড়া ছিল। শামা রেগে রাবেলের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেয় আর বলল, আজ তোমাদের কি হয়েছে? তারপর বন্দুকে টোটা ভরে ট্রিগারে টান দেয়। লক্ষ্যবস্তু খুঁটি গায়েব। শামা বন্দুককে চুমো খেয়ে রাবেলকে ফেরত দিয়ে দেয়। রাবেলের হাতে কয়েক মিনিটের জন্য শামার হাতের আঙ্গুল আটকে থাকে। পরে শামা হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে বন্দুক মাটিতে পড়ে যায়। রাবেল হেসে আমাকে বলছিল, "বাজী ধরতে চাও যুবক" কেন নয়, হাত মিলাও।"

এই ভবঘুরেরা জানেনা যে, বাজী ধরতে আমি কি রকম পটু। অল্পক্ষণেই আমি খোদাদাদকে কাবু করে ফেলি। এরপর রাবেলের সাথে শক্তি পরীক্ষা হল। শক্তি পরীক্ষায় আমি রাবেলকে এমন ধাক্কা দিই যে সে দশগজ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। মর্জিনা এই দৃশ্য দেখে হাততালি দিতে থাকে। শামা রেগে ত্বরিৎ এসে মর্জিনাকে চড় কষে মারে তারপর হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে থাকে।

আমি শামাকে বললাম, 'মর্জিনা তোমার কি ক্ষতি করেছে।'

সে বলল, তুমি চুপ করো। মর্জিনার সমর্থক হয়ে এসেছো। এক রাতের মেহমান আর কেমনভাবে কথা বলে। মনে হয়, তিনিই যাযাবরদের সর্দার। রাবেলের সাথে শক্তি পরীক্ষায় জিতে আপদই হল।

খোদাদাদ হাসতে থাকে। সামনে তাঁবুতে বসে একজন যাযাবর কাঁচি ধার দিচ্ছিল, সে ঘূর্ণায়মান চাকা ও অন্যান্য হাতিয়ার এক পাশে রেখে গলা ছেড়ে গান গাইতে থাকে।

লোকটার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে ঢোলক বাজিয়ে তাদের সাথে গাইতে থাকে। আমরা সবাই সেই তাঁবুর সামনে গিয়ে জমায়েত হই। রাবেলের তাঁবুর লোকজনও উঠে এসে সেখানে হাজির হয়। চতুর্থ তাঁবুতে মাত্র একজন বুড়ো ও একজন বুড়ী বসেছিল। বড় বড় কাঠের গুড়ি আগুনে জ্বলছিল আর আগুনের আলো চারদিকে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। পটভূমিকায় ঢোলকের আওয়াজ তদুপরি যাযাবরদের কোরাস গানের সুর এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। জ্যোৎস্না রাতে সৃষ্টি করেছিল এক রোমান্টিক পরিবেশের। এই গানের সুর পাহাড়ী উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল আর আকাশে লক্ষ তারার মিছিলে ছড়িয়ে পড়ছিল। আকাশে যেন চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আর মিটি মিটি তারাগুলি তাতে সাঁতার কাটছে। শামা নাচছিল আর দেহ যেন নাচের তালে তালে হৃদয়ের আবেগ অনুভূতির সাথে মিশে গেছে। সে আমাদের কাছে, আমাদের নাগালের বাইরে, এখানে সেখানে, ভূ-পৃষ্ঠে আকাশে সর্বত্র যেন নেচে বেড়াচ্ছে। তার ডাক যেন মাটির ডাক। তার নৃত্য যেন বন্য নৃত্য, সৃষ্টির অস্থির নৃত্য। তার মাথার চুল উড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়ে কপালে ছড়িয়ে পড়ছে। নৃত্যের পরবর্তী মোড় নিতে গিয়ে সে কপালের চুল সরিয়ে দেয় তখন যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকার, বিদ্যুৎ আর গানের সুরে যেন সাত আসমানের সূর্য চাঁদ আর নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত মাদকতায় দুলছে আর তারই প্রতীকী ভূ-পৃষ্ঠে নৃত্য করছে। মাদকতায় দুলছে আর তারই মনে হয়েছে, সৃষ্টি, ধ্বংস জীবন মৃত্যু ভগবান ও মানুষ একই সূত্রে গাঁথা আর হৈ চৈ ও আলোড়নের সৃষ্টি করছে, নেচে নেচে বলছে, দেখ দেখ এটা সেই মহিলা যার নাম শামা, আলোর মশাল যার দয়ায় সৃষ্টি হয় মন্দিরের দেবতা ও মানুষ। ..... তাদের তাহজীব ও তমদ্দুনকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করছে। তাদের বুকে জ্ঞান ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস যেন উথলে উঠেছে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মেয়েই বন্য উদ্দাম, সাইক্লোন নৃত্য ও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

আমার মামা আল্লাদাদ খান এসে না পড়লে হয়তো নাচ-গানের আসর ভোর রাত্রি পর্যন্ত চলতো। তিনি এসেই চীৎকার করে উঠলেন, হারামজাদার দল, যাযাবরের জাত, এখনই তোমাদের আস্তানা গোটাও আর আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাও অন্যথায় ...।

শামা নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আর হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ভাইয়ের দিকে তাকাতে থাকে। রাবেল ও খোদাদাদ দু'জনেই আল্লাদাদ খানের দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু তার হাতে পিস্তল দেখে থেমে যায়।

রাবেল বলল, আমরা যাযাবর। আমরা কারও মেজাজ বরদাস্ত করতে রাজী নই। আসমানের নিচে যতটুকু জমি আছে সব আমাদের। যেখানে ইচ্ছা আমরা থাকব আর যেখানে ইচ্ছা আমরা উঠে চলে যাবো।

বেটে আল্লাদাদ খান ছিল একজন ডাকাত। ছোট ছোট গোঁফ ক্ষুদ্রাকৃতির চোখ জোড়া পাথরের ন্যায় জ্বল জ্বল করছিল। রাবেলের বুকের দিকে পিস্তল তাক করে বলল, এটা রংপুরের গ্রাম নয়, এখানে নপুংস থাকে না। এটা আল্লাদাদ খানের গ্রাম। এক গ্রামে দু'টি বাঘ থাকতে পারে না। চুপচাপ এখান থেকে চলে যাও নচেৎ তাঁবু পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেব।

রেগে আমি খোদাদাদকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাদাদের সামনে হাজির হই।

আমি বললাম, মামা এইসব গরীব যাযাবরদের সাথে কেন ঝগড়া করছেন? লড়তে হলে আমার সাথে লড়েন। রংপুরের লোক নপুংস, নপুংসের সাথে মোকাবিলা করো। এসো!

আমাকে দেখে সে বিস্মিত হয়ে পড়ে। সে বলল, আরে শাহজামান এখানে কেন এসেছো, পাহাড়ী তাঁবুর আস্তানায়। নিজের বাড়িতে গেলে না কেন? আবার শামা ও মর্জিনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "এই তাঁবুগুলিকে অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুড়িয়ে দিতে হবে। কারণ গ্রামের যুবকের দল সবাই যাযাবর তরুণীদের আস্তানার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

রাবেল এগিয়ে যায়। আল্লাদাদ পিস্তল বাড়িয়ে ধরে। খোদাদাদ রাবেলকে বাধা দেয়। তারপর নম্রসুরে বলল, আল্লাদাদ খান কাল সন্ধ্যায় আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাব। এটুকু আমাদের সময় দাও।

আচ্ছা কাল সন্ধ্যায় অবশ্যই চলে যাবে। আবার তোমাদেরকে দেখতে পেলে গ্রামের কুত্তা লেলিয়ে দিয়ে ছিড়ে খাওয়াবে।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

"বাড়িতে যাবে না?"

আমি 'না' সূচক মাথা হেলায়ে উত্তর দিই।

"খাজনা আদায় করে কোথা থেকে আসছ?

আজ থলে মনে হয় বেশ ভারী। তার উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ চিকচিক করছিল।

আমি নীরব। রাবেল ও খোদাদাদ আমার দিকে তাকায়। আবার আল্লাদাদ খান দু'জনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "শাহজামান অত্যন্ত চালাক ছেলে।" আল্লাদাদের কথায় বিদ্রুপের সুর। "আমি যাচ্ছি .... যাবার আগে সকালে দেখা করে যেও।"

রাবেল ও খোদাদাদ আল্লাদাদকে নদী পার করে দিতে এগিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর ফিরে আসে। ওরা ফিরার আগেই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই। আমি টাকার থলে শামার কাছে রেখে বললাম, "কাল সকালে আবার তোমার কাছ থেকে ফেরত নেব।"

শামা মুচকি হেসে বলল, "এটা তোমার কাছেই রাখো। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমারই!"

আমি জবাব দিই "তোমাদের মেহমান আমি।" শামা বলল, "আমি তো তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে আনিনি।"

"ভয় পাও নাকি?"

সে আমার হাত থেকে থলেটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "পুরুষ বন্দুক দিয়ে তাঁবু ও সেখানকার মহিলাদের হেফাজত করে। তুমি মাটির ঘরে থাকো, নপুংসকরা এসব কি করে জানবে।"

শিয়রে দু'নালা বন্দুক রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর রাতে রাবেল ও খোদাদাদ তাঁবুতে ফিরে আসে আর তাঁবুর বাইরে চুপিচুপি অনেকক্ষণ কি জানি আলাপ করছিল। যদিও আমি শুয়েছিলাম, আমি তাদের সব আলাপ শুনতে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছিলাম। দু'নালা বন্দুকের ওপর আমার হাত রাখা ছিল। দু'জনেই শামাকে তিরস্কার করছিল। শামা বলছিল, তার করার কিছুই নেই কারণ সে তাকে কথা দিয়েছে। রাবেল ও শামা পরস্পরকে গালাগালি করছিল আবার খোদাদাদ বলল, চলো আমরা তাকে হত্যা করি আর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার লাশ পুতে ফেলি। শামা এতে রাজী হয়নি। সে বলল, আল্লাদাদকে ভরসা করা যায় না, সে তোমাদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে পারে। যাযাবররা কি কখনও খুনখারাবি করে? অবশ্য চুরি ডাকাতি হলো ভিন্ন কথা। কিন্তু যাযাবররা তো কখনও কাউকে হত্যা করেনি। নিজেদের বংশের মুখে কলঙ্ক মেখে দিতে চাও কি! অবশেষে খোদাদাদও রাবেলকে শামার কথা শুনতেই হল। খোদাদাদ ও শামা কথা তাঁবুতে এসে আগুন নিভিয়ে দেয় আর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। মর্জিনা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। শামাও তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। খোদাদাদ আমার কাছে এসে শুয়ে পড়ে। আমি এখন খোদাদাদ ও শামার মাঝখানে শুয়েছিলাম। তাঁবুর দরজা কেউ বন্ধ করেনি। বাতাসের রেশ তাঁবুর ভেতরেও প্রবেশ করছিল। দরজার বাইরে কুত্তা বসেছিল, একটুখানি নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠে। আমি তখনও জেগে। শামা ঘুমিয়ে নাক ডাকছিল। আমি পাশ দিয়ে শুয়ে শামার দিকে তাকাই। চাঁদের আলো তার চোখে মুখে চুলে এসে পড়েছে। গালের নিচে হাত রেখেছে। সে আমার এত কাছে শুয়েছিল যে, আমার হাত প্রসারিত করলেই তার গালে গিয়ে লাগবে।

তার গালে হাত বুলানো, তার ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দেওয়া আর বুকে আলিঙ্গমাবদ্ধ করার সুপ্ত সাধ মনের মাঝে চাড়া দিয়ে উঠে। আমি দেহের আহবানে সাড়া দিয়ে দিইনি। আর কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকি যেন জৈবিক চাহিদার ডাক কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। কিন্তু যৌবনের টানে বুকের স্পন্দন আর রক্ত চলাচল দ্রুততর হয়েছে। দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে যেন একই শব্দ বেরুচ্ছে, শামাকে দলিতমথিত করে নিঃশেষ করে দাও। আমি ধীরে ধীরে তার কাছে সরে আসি তার পর পেছন ফিরে খোদাদাদের দিকে তাকাই। সে ঘুমে অচেতন আর গরগর শব্দ করছিল। ধীরে ধীরে আমি আলতোভাবে শামার বাম হাতে আঙ্গুলের উপর হাত রাখি। কোন নড়াচড়া নেই। আমার গরম হাত তার বরফের ন্যায় শীতল হাতের উপর পড়ে থাকে কিন্তু কোন অনুভূতি নেই। এবার আলতোভাবে হাতে তার গাল স্পর্শ করি আর আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুনের লাখো ফুলকি যেন দাপাদাপি করে উঠে। আর সাইক্লোনের ধাক্কায় নদীর ঢেউ যেন তীরে আছড়ে পড়ছে। কানে একটি সুর যেন বারবার বেজে উঠছিল, শামাকে পিষে ফেল, দলিতমথিত করে নিঃশেষ করে দাও। পাশে অন্যদিক মুখ করে শুয়েছিল খোদাদাদ আর মর্জিনা। তাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিই, তারপর শামার আরও কাছে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অপূর্ব শিহরণ যেন কানাকানি করছিল। আনন্দের গুঞ্জন আর সুখের নদীর স্রোতধারা, সেই স্রোতে সাঁতার কেটে আমি শামার অতি নিকটে চলে এসেছি আমি হাতের আঙ্গুল তার হাতের আঙ্গুলে ধরে জোরে চাপ দিই। কিন্তু শামা জেগে উঠেনি বরং তার চোখ যথারীতি বন্ধ ছিল। ধীরে ধীরে শামা আমার হাত মুঠায় ধরে এমন জোরে মোচড় দেয়, অন্য কেউ হলে চীৎকার করে উঠতো।

আমি বাঁধা দিতে গিয়ে শুধু ভাবছিলাম এত শক্তি শামা কোথা থেকে পেলো। ফুলের ন্যায় এই হাতে এত শক্তি কোথা থেকে পেলে? আমি নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। হাতের ব্যথায় আমি কুঁকড়ে গেছি তারপর অন্যদিকে পাশ ফিরে শুতে বাধ্য হই। আমার পিঠ তার দিকে কিন্তু হাত তখন তার হাতের মুঠোয়।

শামা বললাম, বিণুনী ধরবে কি?

আমি বললাম, তুমি মহিলা নও চন্ডাল।

সে স্মিত হাসিতে বলল, 'আর হাতের মোচড় আর বেদনা।

আমি উত্তর দিলাম, দৈত্যের বংশধর, তুমি শূকরণী।

সে আবার চুপিসারে বলল, গীত শুনবে?

আমি জবাব দিই, আমার কথা বাদ দাও। তোমার চৌদ্দগোষ্ঠীর উপর অভিশাপ নাজিল হোক।

সে বলল, আমার কাছে জেলেদের গান অত্যন্ত প্রিয়। নদীর ঘাটে ওদের গান শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে।

"চুপ করো। আল্লাহর দোহাই, কেউ শুনলে বিপদ হবে।" আমার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

আমি কাউকে ডরাই নাকি? তবে জেলেদের গীত শুনবে শুন। সে ধীরে ধীরে গান গাইতে থাকে। তার গানের সুরে দুষ্টুমী, আনন্দ ও সুখ মিশ্রিত ছিল।

আমি রেগে বললাম, হারামজাদী।

সে আমার হাতের কব্জি আরও মুচড়ে দেয়। বলল, শামা যাযাবরের কন্যা, সে মাটির ঘরে বসবাসকারী কিষাণ কন্যা নয় যে, জমিদারের ছেলেকে দেখেই প্রেমে হাবুডুবু খাবে। আর জীবনের মূল্যবান বস্তুকে তার কাছে সোপর্দ করে দেবে। তোমরা ভদ্রলোক, জঙ্গলীদের স্বভাব কি জান? একথা বলার পর সে মুঠোর ভেতর আমার কব্জিতে আরও চাপ দেয়। ওহ, দারুণ ব্যথা হাতে আর শামার হাতের চাপ ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, 'আমি তাঁবুতে নয় জঙ্গলে শুয়ে আছি। আর কোন বন্য পশু যেন আমার বাহু কামড়ে ধরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাত তার কবল থেকে ছাড়িয়ে না নিলে হয়তো আমার হাত পর্যন্ত চিবিয়ে খাবে। হাতের ব্যথা দারুণ হয়তো হাঁড় পর্যন্ত মচকে যাবে। শেষ চেষ্টা হিসাবে আমার অন্যহাতে শামার গালে চড় কষে দিই। পটাশ আওয়াজের সাথে শামার মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ শুনা গেল। তারপর নীরব। খোদাদাদ বিড়বিড় করে ঘুম থেকে উঠে বসে পড়ে। শামাও মিছামিছি জেগে উঠে বলল, "কি ব্যাপার পথিক?"

আমি জবাব দিই। "কিছুই না।"

খোদাদাদ বলল, আমি একটা চীৎকার শুনেছি।

"হয়তো পরদেশী অতিথি ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়েছে। খুব বাজে স্বপ্ন ছিল নাকি?"

রাগে আমার রক্ত টগবগ করছিল কিন্তু আমি নীরব থাকি।

কি ব্যাপার? হঠাৎ মর্জিনা জেগে উঠে বলল।

কিছুই নয়। পরদেশী ঘুমের মাঝে ভয় পেয়েছে। হয়তো বাজে স্বপ্ন দেখেছে। শামা দৃঢ়তার সাথে বলল।

'শুয়ে পড়ো।' খোদাদাদ পাশ ফিরে শুয়ে বলল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

অনেক চুপচাপ। তারপর শামা আস্তে করে বিছানা ছেড়ে উঠে পরদা সরিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে যায় আমিও কিছুক্ষণ পর বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে আসি। চাঁদের আলোয় উপত্যকা ঝলমল করছিল। শামা নদীর ধারে বসে মুখ ধুইতেছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, মাঝ রাতে মুখ ধুইলে কি হবে? সে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। দেখলাম, তার দাঁত দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আর ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে। হয়তো এখানেই আমার হাতে চড় পড়েছিল। আমি তার পাশে বসে আর হাতে পানি তুলে দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আঘাত পাওয়া জায়গায় মাত্র রক্তের দু'টি দাগ রয়ে গেছে।

এখন চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম। কোথাও হৈ-চৈ নেই। রাবেলের চীৎকার আর শামার নৃত্যগীত। শামা এখন আমার সামনে নীরবে বসেছিল। আর দৃষ্টির গভীরে যেন চাঁদের কিরণ চিকমিক করছে।

আমরা দু'জন নীরবে দাঁড়িয়ে। সারা উপত্যকায় নীরবতা বিরাজমান। আমরা একে অপরকে দেখছিলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দু'টি হৃদয় মিলিত হতে যাচ্ছে আর হাতের আঙ্গুল দেহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। আমাদের বুকের স্পন্দন এক অভিন্ন। তাকে যেন আমি যুগ যুগ ধরে চিনি। আজ থেকে লাখো বছর আগে যেন তাকে আমি জানি-চিনি। সৃষ্টির পেট থেকে পয়দা হয়ে আসর গড়িয়ে গড়িয়ে একে অন্যের কাছে এসে পড়েছি। এই মিলনের সাক্ষাতের মুহূর্তটিই যেন স্থায়ী অক্ষয় হয়ে থাকবে অন্য কিছু নয়। এই মুহূর্তে তাকে কত আপন মনে হয়েছে। পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে সে যেন আমার কেউ নয়। আবার সেই রাতের হৈ চৈ, দরজার পর্দা পতপত করছে, পাহাড়ে শিয়াল ডাকছে। নদী কলকল বয়ে যাচ্ছে। চাঁদ যেন আকাশে হাসছে আর পরিবেশ চঞ্চল হয়ে উঠে। শামার পায়ে চলার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। প্রথম মুহূর্তে যেন সবকিছু চুপ আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রথম মুহূর্তটি কি কখন পর মুহূর্তের মতো হয়। না হয় না। জীবনের পরিমাপ তা হলে কিভাবে করা যায়?

শামা তাঁবুর পরদা ঠেলে ভেতরে চলে যায়। আমি তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম তারপর একটি পাথরের উপর বসে পড়ি। পাশে কুকুরটি শুয়েছিল, আমি তার গায়ে হাত বুলাতে থাকি। কুকুরটাও আমার পায়ে লেহন করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে তারার মেলায় পাথরের উপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি ভোর হয়ে পড়েছে। শামা নদীর তীর থেকে খচ্চরের পিঠে খড়ি ভর্তি করে তাঁবুর দিকে ফিরছে। সে আমার কাছে এসে থেমে যায়, তারপর খড়ির বোঝা খচ্চরের পিঠ থেকে নিচে নামিয়ে রাখে। সে তাঁবুর ভেতরে যেতে উদ্যত হলে আমি বললাম, আমার থলেটা দিয়ে দাও। আমি চলে যাব এরপর আমি খচ্চরের লাগাম আমার হাতে নিয়ে নিই।

শামা বিস্ময়ের সুরে বলল, কিসের থলে?

'যেটা তোমাকে রাতে রাখতে দিয়েছিলাম।'

"কি বলছ তুমি? রাতে কি দিয়েছ।"

"এটা ইয়ার্কির সময় নয়? আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।" আমি গর্জন করে বললাম।

খোদাদাদ ও রাবেল এদিকেই আসছিল। খোদাদাদ বলল, "কি থলের কথা বলছ?"

আমি চীৎকার করে বললাম, "আমি তাকে দিয়েছিলাম। রাতে মর্জিনার সামনেই তো দিলাম, কোথায় মর্জিনা, ডাক তাকে ...।"

শামা বলল, মর্জিনা জঙ্গলে লাকড়ি কুড়াতে গেছে, এখনো ফিরেনি।

রাবেল মুচকি হেসে বলল, "টাকার থলে তাকে কেন, দিয়েছিলে?"

"আমি ভেবেছিলাম, তার কাছে হেফাজতে থাকবে।"

"আচ্ছা তাহলে কি তুমি আমাদের প্রতারক মনে করো।" রাবেলের কণ্ঠে রাগের সুর। "সারারাত তোমাকে আশ্রয় দিলাম, ডাকাতের হাতে প্রাণে জীবন দানের হাত রক্ষা করলাম আর এখন তুমি আমাদের চোর টাওরাচ্ছ।"

শামা রাবেলের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এক্ষুণি চলে যাও—এই মুহূর্তে নচেৎ ....।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শামার দিকে তাকালাম, রাবেলকে এক নজর দেখে নিলাম আবার খোদাদাদের দিকে তারপর খচ্ছরটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি।

আজ, আমি একা। একা পথ চলছি। চারদিকে সব কিছুই একা মনে হচ্ছিল। টাকার থলে হারানোর কোন ক্ষোভ বা বেদনা ছিল না। তবুও কি একটা বস্তু হারিয়ে যাওয়ার বেদনা যেন আমার কল্পনা রাজ্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ব্রেনে এক বিচিত্র অনুভূতি এক অজানা দ্বন্দ্ব ছেয়ে আছে, যার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শামা যাযাবর গোষ্ঠীর, নিজের উপর, ধীরে চলা খচ্ছর কারও উপর রাগ বা ক্ষোভ ছিল না।

একটা স্থায়ী হালকা উদাসীনতা যেন চারিদিকে ছেয়ে আছে। খচ্ছরটা ধীরে ধীরে নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। একটি খরগোস আমার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল দ্রুতগতিতে। গাছের একটি শেয়ালের লেজও আমার নজর এড়ায়নি। কিন্তু আমার হাত বন্দুকের ট্রিগারের দিকে যায়নি। দূরে একটি শুকনো গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কে জানি আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলল। শামা বলছিল, "পথিক নেমে এসো।"

আমি খচ্ছরের পিঠের উপর থেকে নেমে পড়ি আর দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি কেন সে এসেছে আর কোথায় যাবে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা টিলার উপর এসে পড়েছি যেখান থেকে দু'টি উপত্যকার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। একদিকে রংপুরের উপত্যকা অন্যদিকে চেমন কোট মাঝখানের সমতল দু'টি উপত্যকাকে মিলিত করেছে। দূরে বয়ে যাচ্ছে নদী। নদীর পানি ঝলমল করছিল। আমি শামার দিকে চোখ তুলে তাকাই। সে কামিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয়, তারপর টাকার থলেটা বের করে আমার হাতে দিয়ে দেয়। আমি বিস্ময়ের সাথে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার দৃষ্টি তার আহত ঠোঁটের উপর গিয়ে পড়েছিল। সেই মুক্তোর ন্যায় সুন্দর মিহিন ঠোঁট-যুগল আমি তার অধরের দিকে ঝোঁকে পড়ি।

সে মুখ ঘুরিয়ে আস্তে করে বলল,

"আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'বিয়ে।'

সে চুপচাপ আমার দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকে। আমি ধীর কণ্ঠে বললাম, বিয়ে তাও আবার তোমার সাথে আমি ভাবতে থাকি।

"তুমি আমার গাঁয়ে চল সেখানে তোমাকে আমি বিয়ে করব।"

"তোমাদের গ্রামে ।"

"হাঁ ঐ যে আমাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে .. ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হতভম্ব হয়ে বলল, "আমি গ্রামে গিয়ে কি করব?"

"আমি জমিদারের ছেলে।" আমি গর্বভরে বললাম। সেখানে আমার বাড়ি-ঘর, জমি-ক্ষেত, গবাদিপশু চাকর-নফর, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান সব কিছু ....। আমি থেমে গেলাম।

সে বলল, আমি চাই, তুমি আমার সাথেই থাকবে।

"তোমার সাথে কোথায়?"

ধর্মকোটে আমার গোত্র থাকে। আমার বাবা যেমন তার জ্ঞাতি আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করেছে তেমনি। ধর্মকোটে এখন বরফ পড়ছে দারুণ শীত। চারিদিকে সাদা ধবধবে সাদা ...।

শামার বন্য চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করে উঠে। সে দৃঢ়তার সাথে আমার হাত ধরে বলল, "আমরা সেখানে একটি তাঁবুতে থাকব। তোমার ইংলিশ বন্দুক দিয়ে ভান শিকার করা যাবে। তুমি হবে আমার গোত্রের সর্দার। আর রাতে আমি নাচব। তুমি তো আমার নাচ দেখেছো। সে তার বাহু দুলিয়ে বলল।

আমি তাদের যাযাবর গোত্রকে দেখেছি, দেখেছি বরফাবৃত এলাকা। ময়লা তাঁবুর আস্তানাও দেখেছি। তাদের বিছানা থেকে পুরানো কাপড়ের বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হয়। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা ফুটে ... "কিন্তু, শামা, আমার ক্ষেত, জমি, আমার বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ আসবাবপত্র, গাড়ি, আত্মীয়স্বজন এদেরকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না।"

শামা সরল বালিকার ন্যায় বলল, বেঁচে থাকার জন্য এই খোলা সমতলভূমি আর আকাশ কি যথেষ্ট নয়?

"তুমি বুঝতে পার না আমি বলছি তোমাকে কেমন করে বুঝাবো। তুমি হলে যাযাবর ....।

ধপ করে তার চোখের উজ্জ্বলতা নিভে গেল। সেই প্রাণ চাঞ্চল্য যেন মিইয়ে পড়লো, সে আমার হাত ছেড়ে দেয়।

তারপর থেমে থেমে বলল, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি। তুমি সেই মানুষ নও।

'কি ধরনের মানুষ?'

"বাদ দাও। তুমি বুঝবে না।"

"আমি সত্যিই দুঃখিত।" আমার উত্তর।

কিন্তু মাঝখানে শামা আমাকে বাধা দিয়ে বললো, আমি এক্ষুণি ধর্মকোট যেতে চাই। আমি আর নিজের ভাইয়ের কাছে ফিরে যাব না। রাবেল আমার মুখ পর্যন্ত দেখবে না। আজ থেকে মর্জিনা আমার কাছে মৃত। তুমি কি খচ্ছরটা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ো দেবে। কারণ আমার পথ অনেক দীর্ঘ।

রাস্তা অনেক দূর কিন্তু সফরের কোন গন্তব্যস্থল নির্ধারিত নেই। আমি ভাবছিলাম, লক্ষ বছর পর দু'টি প্রাণ মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল। পর মুহূর্তে একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মাঝখানে সাত সমুদ্রের ব্যবধান। প্রথম দেখায় জঙ্গলের সাথে মানুষের প্রেম গড়ে উঠে আবার পরক্ষণে সেই বন্ধন ছিঁড়ে যায়।

আমি ধীর কণ্ঠে বললাম, শামা, এক মুহূর্ত পরের মিনিটের মত হয় না, হতে পারে না।

'কি বলছ তুমি?' তার চোখে মুখে বিস্ময়। "বাদ দাও তুমি বুঝবে না এসব।"

আমি খচ্ছরের লাগাম তার হাতে সোপর্দ করি। সে হাতে তার ঠোঁটের আহত স্থানটা মুছে নিয়ে আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, আচ্ছা বিদায় ...। বিদায় বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ধর্মকোটের দিকে খচ্ছরটাকে দাবড়িয়ে নিয়ে দে ছুট। আমি অনেকক্ষণ তার যাত্রা পথে চেয়ে থাকি। আমি একবার ধর্মকোটের দিকে কয়েক কদম এগিয়েছিলাম, তারপর আবার গ্রামের দিকে পাহাড়ী পথ ধরে ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~